মানব অধিকার
এবং
ভারতীয় মূল্যবোধ

বিচারপতি এম. রামা জইস্

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ প্রকরণ গ্রন্থ মালা

৯৭/১

মানব অধিকার
ও
ভারতীয় মূল্যবোধ

বিচারপতি এম রামা জইস্

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ

সি - ২/১০, সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ

নতুন দিল্লী - ১১০০১৬

অনুবাদকও প্রকাশক ঃ ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

এন সি টি ই দলীল নং — ৯৭/১৫

অনুবাদক ঃ ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

মূল প্রকরণ গ্রন্থমালার সম্পাদক ঃ ডঃ সি. এইচ. কে. মিশ্র
সম্পাদক ঃ ডঃ এন. খোস্‌লা
সমন্বয়কারী ঃ সোহন স্বরূপ শর্মা এবং গুলসন্ কুমার

ইংরাজী মূল গ্রন্থটি সদস্য সচিব, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন, সি ২/১০, সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাগরি প্রিন্টার্স, নবীন শাহ্‌দ্রা, দিল্লী ১১০০১৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ ২৫/৩ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্ট মিডিয়া, ১১/১ দূর্গা পিথুরী লেন, কলকাতা -৭০০০১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রাক্‌কথন

মানব অধিকার শিক্ষার গুরুত্ব বর্তমানে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। শিক্ষা ভবিষ্যত প্রজন্মের বিবেক এবং মূল্যবোধ গঠন ও পরিমার্জন করার আশা যোগায় এই উপলব্ধি থেকে এবং অন্যত্র মানব অধিকার শিক্ষা প্রসারের দৃষ্টান্ত মাথায় রেখে এন সি টি ই "মানব অধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ" (Human Rights and National Values) নামে একটি প্রকল্পের সূচনা করেছে। নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত স্বল্পমেয়াদী শিক্ষণসূচীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষককে মানব অধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তোলা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আয়োজিত অনুরূপ কার্যক্রমগুলিকে সাহায্য করা ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে মানব অধিকার আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। যার চূড়ান্ত পরিণতি হল মানব অধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণা। ঐ সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি স্বাক্ষরিত এই ধরণের অন্যান্য চুক্তি ও দলিল সমূহ সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করেছে যে মানব অধিকারের তত্ত্ব যেন পাশ্চাত্যেই উদ্ভুত। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। কেননা হাজার হাজার বছর ভারতের ধর্মগ্রন্থগুলি মানুষের মর্যাদা ও সাম্যের বাণী প্রচার করে আসছে। মানব অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণার পরবর্তী কালে রচিত আমাদের দেশের সংবিধানের মধ্যে আর্ন্তজাতিক ঘোষণার অনেক অনুচ্ছেদ সংকলিত হয়েছে। আক্ষরিক ও প্রকৃত অর্থে মানব অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতবর্ষেরও আছে। জাতীয় মানব অধিকার কমিশন ১৯৯৩ সালে স্থাপিত হয়। কমিশনের প্রথম সভাপতিবিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মানব অধিকারের বার্তা বহন করার জন্য শিক্ষার অবদানের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরনায় স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে মানব অধিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ বিভিন্নভাবে বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্রের আর্শীবাদ লাভ করে এবং যথাযথ যত্নসহকারে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের জন্য বিশেষ উপকরণের ব্যবস্থা এবং ভিডিও অনুষ্ঠানসূচী রচনা করে। ১৯৯৭ সালের ২৩শে জুলাই থেকে ২৭শে জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের মানব অধিকার এবং জাতীয় নৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত তৃতীয় কর্মশালাটি বাঙ্গালোরে আয়োজিত হয়। ঐ কর্মশালায় পঞ্জাব এবং হরিয়ানা উচ্চ-ন্যায়ালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি এম রামা জইসের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। ভারতের বৈদিক সাহিত্যের উপর তাঁর গভীর অর্ন্তদৃষ্টি আছে। কর্মশালায় প্রদত্ত তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানব অধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধের উপরে একটি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। তিনি তৎক্ষনাৎ সেই প্রস্তাবে সম্মত হন। কেবলমাত্র গ্রন্থটি রচনার জন্য নয় উপরন্তু জাতি ও মানবতার প্রতি দায়িত্ববোধ স্বরূপ ১৯৯৭ সালের ১১ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্যে বর্তমান পুস্তকটি রচনা, মুদ্রণ ও বিতরণে সাহায্য করার জন্যও আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি নিশ্চিত যে এই গ্রন্থ মানব অধিকার এবং ভারতীয় মূল্যবোধ বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় অর্ন্তদৃষ্টি দান করবে ও একটি সহযোগী পুস্তক হিসাবে শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকদের সাহায্য করবে। এই পুস্তকের সংকলিত তেরটি অর্ন্তদৃষ্টিমূলক পরিচ্ছদে অধুনা অনেক প্রাসঙ্গিক মামলার উল্লেখ করে শিক্ষার অধিকার, মহিলাদের বিশেষ অধিকার এমনকি যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়ে মানব অধিকার সুরক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। এই বইয়ের লক্ষ্যের স্পষ্টতা সাধারণ পাঠক এবং আইন বিশেষজ্ঞদের সমানভাবে প্রভাবিত করবে।

আমি এই প্রকরণ গ্রন্থ অনুক্রমের সম্পাদক ডঃ সি কে এইচ মিশ্র এবং এই সংখ্যার সম্পাদক ডঃ ডি এন খোশলার কাছে কৃতজ্ঞ যেহেতু তাঁরা এই প্রকরণগ্রন্থ রচনার বিষয়টি দেখাশোনা করেছেন।

নতুনদিল্লী
১০ই নভেম্বর ১৯৯৭

জে এস রাজপুত
সভাপতি, এন সি টি ই

অনুবাদকের কথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার ফলে এবং সংবাদ মাধ্যমের দৌলতেএমন একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে মানবাধিকারের তত্ত্ব যেন পাশ্চাত্যেই উদ্ভুত। কিন্তু বিচারপতি রামা জইসের ইংরাজী ভাষায় লেখা HUMAN RIGHTS AND INDIAN VALUES বইটি পড়লে আমাদের সেই ধারণা পাল্টাতে হয়। এন সি টি ই তথা রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এই বইটিতে বিচারপতি রামা জইস নানা প্রামাণ্য তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে মানবাধিকার সংক্রান্ত ভারতীয় মূল্যবোধ সম্ভবতঃ প্রাচীনতম। বেদ, মহাভারত, মনু সংহিতা, তৈত্তিরীয় উপনিষদ, কাত্যায়ন, কামন্ডক, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে বিচারপতি রামা জইস দেখিয়েছেন যে স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে মূল্যবান মানবাধিকার গুলিকে শনাক্তকরণ এবং স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্র এবং নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর এইসব মানবাধিকার রক্ষা করার ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি আর ও দেখিয়েছেন যে এইসব প্রাচীন গ্রন্থে মানবাধিকার সংক্রান্ত যে সব নির্দ্দেশাবলীর উল্লেখ আছে তার অনেকগুলিই মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় এবং ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদালতে আনা মামলার রায়ের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েছেন যে কিভাবে ভারতবর্ষের মানবাধিকারগুলি সুরক্ষিত হয়েছে।

উপরিউক্ত কারণে HUMAN RIGHTS AND INDIAN VALUES বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রাথমিক শিক্ষক এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করার দায়িত্ব নিয়েছি। কেননা, এই বইটির সাহায্য নিয়ে তাঁরা মানবাধিকার ও ভারতীয় মূল্যবোধের বিভিন্ন দিকগুলিকেপ্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে অনায়াসে প্রসারিত করতে পারবেন বলে আশা রাখি।

রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সংস্থার অধিকর্তা হিসাবে নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এই বইটি অনুবাদ করে আমি নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হয়েছি। কারণ বলতে দ্বিধা নাই যে বিচারপতি রামা জইস্ যে সব প্রাচীন গ্রন্থের উক্তি এবং ন্যায়ালয়ের রায়ের উল্লেখ করেছেন তার অনেকগুলিই আমার অজানা ছিল। এই অনুবাদের সুবাদেই সেগুলি সম্বন্ধে আমি জানবার সুযোগ পেয়েছি।

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত এই বইটির অনুবাদ ও বিতরণের কাজে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই সুযোগে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এই অনুবাদ গ্রন্থটির পান্ডুলিপি পরিমার্জ্জনে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শ্রী ফাল্গুনী চক্রবর্তী, শ্রী নিলয় মুখার্জ্জী ও ডঃ মিতা চক্রবর্তী। এঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

নভেম্বর, ১৯৯৮

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ

ভূমিকা

মানব অধিকার এবং ভারতীয় মূল্যবোধের চিরন্তন উৎস

কুলজি বিচারে মানবাধিকার সংক্রান্ত ভারতীয় মূল্যবোধ সম্ভবত প্রাচীনতম। প্রাচীনতম দলিল হিসাবে স্বীকৃত ঋগ্‌বেদ ঘোষণা করে যে সকল মানুষই সমান এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সূত্রে আবদ্ধ। অথর্ববেদ অনুযায়ী খাদ্য এবং পানীয়ের উপর সকল মানুষের অধিকার সমান। উপনিষদ (শ্রুতি) সহ বেদগুলি ছিল ধর্মের আদিম উৎস। এইগুলি ছিল সমস্ত মানবিক অধিকার এবং কর্তব্যবোধের সংক্ষিপ্ত সার। ব্যক্তি তথা সমাজের সুখ আহরণের জন্য এই গুলি মান্য করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করা হত। স্মৃতি ও পুরাণগুলি ছিল নাগরিক অধিকার এবং ফৌজদারী দায়বদ্ধতা (ব্যবহার ধর্ম) এবং রাজধর্ম (সাংবিধানিক আইন) সহ ধর্মের বিধিসমূহের সংকলন। এবং এই সমস্ত বিধিই বেদগুলির মধ্যে সংযোজিত মৌলিক আদর্শ সমূহের ভিত্তিতে বিকশিত হয়েছে। রাজধর্ম বিষয়ে আরও অনেক পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ছিল যার মধ্যে মন্ডক, শুক্রনীতি এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকলের জন্য সুখ আহরণ করাই ছিল এই সব গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

এ এস দীক্ষিত বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার [১৯৯৬ (৯) এস সি সি ৫৪৮] মামলায় ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ধর্মের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক রচনার উল্লেখ করে ধর্মের অর্থ বিষয়ে বিচারপতি শ্রী কে রামস্বামী বলেছেন ঃ 'ধর্ম শব্দটি তাকেই তুলে ধরা, সমর্থন করা, এবং পরিচর্যা করার নির্দেশ করে যা সামাজিক নিয়মকানুন এবং সর্বসাধারণের মঙ্গল এবং মানবজাতির অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রেখে সমাজের স্থায়িত্ব বজায় রাখে, পরিচর্যা করে অথবা সমর্থন করে।

যাহাই এইসব উদ্দেশ্য সাধন করতে সাহায্য করে তাহাই ধর্ম

"তাই ধর্ম হল সেই বৈশিষ্ট্য যা স্বয়ং অনুমোদিত অথবা সচেতনতা অথবা একজনের নিজের সুখের জন্য যর্থাথ ভাবনা থেকে উদ্ভূত এবং ভয়, কামনা, অসুখ থেকে মুক্ত সকলের মঙ্গল, সুচিন্তা এবং ভাতৃত্ববোধের চিন্তাকে লালন করে" (৭৮-৭৯ অনুচ্ছেদ)।

এইভাবে যে সকল নিয়মকানুন বেদগুলি প্রবর্তিত মৌলিক নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যেগুলির উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের সুখ আহরণ করা— তাই ধর্ম। সমস্ত মৌলিক মানব অধিকারই তার অন্তর্গত। স্মৃতি এবং পুরাণ সমূহে সংযোজিত নিয়মকানুন, প্রথা, রীতি বা অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে যেগুলি বেদে বর্ণিত ধর্মের মৌলিক নিয়মাবলীর পরিপন্থী, সেগুলি অসিদ্ধ বলে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। মহাভারত রচয়িতা ব্যাস, যিনি চারটি বেদের সম্পাদনা করেছেন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এই নীতি প্রণয়ন করে গেছেন।

श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते ।
तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोर्द्वैधे स्मृतिर्त्वरा ॥

"বেদে যা ঘোষিত হয়েছে তার সঙ্গে স্মৃতি ও পুরাণগুলিতে বর্ণিত নীতিগুলির কোন বিতর্কের সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে বেদে ঘোষিত নীতিগুলিই গ্রহণযোগ্য হবে এবং প্রচলিত থাকবে। এই ব্যবস্থা ধর্ম এবং অধর্ম কি তা নির্ণয় করতে এবং

ধর্মকে গ্রহণ ও অধর্মকে বর্জন করতে সাহায্য করে। ইহা আমাদের সংবিধানের ১৩ নম্বর ধারার সমগোত্রীয়। ঐ ধারা আইনসভা প্রণীত আইন অথবা রাষ্ট্রকর্তৃক প্রণীত কোনও নিয়মাবলী যদি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে তাহলে সেই আইন তথা নিয়মাবলী বাতিল বলে গণ্য হবার সুপারিশ করা আছে।

সেজন্য আকরিক থেকে যেভাবে মূল্যবান সোনা নিষ্কাশন করা হয়, ঠিক সেইভাবে যে সকল নিয়মাবলীর চিরন্তন মূল্য আছে সেই মানব অধিকার এবং কর্তব্য সম্বলিত ধর্মের বিধানগুলিকে নিষ্কাশন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র সেই ধর্মগুলি পালন করলেই সকলে সুখলাভ করতে পারবে।

ধর্মের সকল বিধানের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে মূল্যবান মানব অধিকারগুলিকে সনাক্তকরণ এবং স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্র এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর এইসব মানব অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে এইসব মূল্যবোধগুলির মধ্যে অনেকগুলি মানব অধিকার আছে যেগুলি এখন মানব অধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় এবং ভারতীয় সংবিধানেরও তৃতীয় অংশে সংযোজিত হয়েছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত, মেনকা গান্ধী বনাম ভারত সরকার [১৯৭৮ (১) এস সি সি ২৪৮] মামলায় ঐ দিকটির কথা উল্লেখ করেছেন।

"এইসব মৌলিক অধিকারগুলি সেই সমস্ত বুনিয়াদি মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে যেগুলি এই দেশের জনগণ বৈদিক যুগ থেকে লালন পালন করে আসছে। মূল্যবোধগুলি নিরুপণ করা হয়েছে ব্যক্তির মর্যাদাবোধ রক্ষা করার জন্য এবং এমন অবস্থায় সৃষ্টি করার জন্য যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পেতে পারে" (২২৭ পৃ:)।

মানব জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হল ঃ

सवे जनाः सुखिनो भवन्तु ।

অর্থাৎ সকল মানুষ সুখী হোক।

সুখের অধিকার

জীবনের প্রতি পর্য্যায়ে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সুখী হওয়া সকল মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্খা। যেহেতু সুখ ব্যতিরেকে জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে সেইহেতু সুখ একটি স্বাভাবিক মৌলিক অধিকার। এই কারণে প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ ভোগ করার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক মানব অধিকার বলে পরিগণিত হওয়ায় এই অধিকার সকল প্রকার অধিকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে যা পূরণ করলে সুখী হওয়া যায়। একজন ব্যক্তির নিজ প্রচেষ্টার সাহায্যে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করার এবং এভাবে নিজের, পরিবারের ও অন্যান্য সকল মানুষের জন্য সুখ আহরণ করার ক্ষমতা আছে।

তা সত্ত্বেও অভিলাষ পূর্ণ না হওয়াই ব্যক্তির অসুখী হবার কারণ। সে তাঁর ভুল এবং দুষ্কর্মের দ্বারা নিজের এবং প্রতিবেশীর অশান্তির কারণ হতে পারে। বাস্তব সত্য হল এই যে, জীবনে সুখ এবং দুঃখ অথবা কষ্টের মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী। দুই প্রকার কষ্ট আছে। এর মধ্যে প্রথমটি হল মানুষের আয়ত্ত্বের বাইরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা ঈশ্বর সৃষ্ট ঘটনা যা আইনি পরিভাষায় 'ভিস্-মেজর' (vis-major) বলে অভিহিত। অসুখ ও দুর্ঘটনায় পিতামাতা, সন্তান, আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের অসময়ে মৃত্যু এবং বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদির জন্য জীবন, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এই প্রকার কষ্টের উদাহরণ। যেহেতু এই ধরণের কষ্ট এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নাই সেহেতু মানুষকে এইসবের জন্য কষ্ট ভোগ করতেই হয়। এইসব কষ্ট প্রশমনের একমাত্র উপায় হল আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীজনের সঙ্গে এই দুঃখ ভাগ করে নেওয়া এবং রাষ্ট্র অথবা সমাজ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগীতার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় প্রকারের বিভিন্ন কষ্টগুলি মানুষ নিজেই অন্যের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্টি করে এবং অন্যের সুখ বিনাশ করে।

মানুষের সৃষ্টি করা দুঃখ কষ্টগুলি দূর করে কিভাবে সুখের অধিকার অর্জন করা যায় তা যুগ যুগ ধরে সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে আছে। মানুষের স্বাভাবের উপর একটি সুগভীর গবেষণার পর এই দেশে মনুষ্যজাতির চিরন্তন সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল। দেখা গেছে যে মানুষের ভাল অথবা মন্দ প্রতিটি কাজই আকাঙ্খা থেকে উদ্ভূত হয়। মানবজীবন অথবা মানবিক প্রবৃত্তির মূল দিকগুলিকে নিম্নলিখিত স্তবকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

अकामस्य क्रिया काचिद्दृश्यते नेह कर्हिचित् ।
यद्यद्धि कुरुते किन्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥

"মানুষের এমন কোন কাজই নাই যা আকাঙ্খামুক্ত। মানুষ যা কিছু করে তা আকাঙ্খার তাড়নারই ফল।" মনু- II- ৪

মানব প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে তাঁর আকাঙ্খা (কামনা) কাজ করে থাকে। পরবর্তী প্রশ্নটি ছিল যে মানুষের সহজাত আকাঙ্খাগুলি কি? দেখা গেছে এগুলি হল ভালভাবে জীবনযাপন, ভাল খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এবং সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি (অর্থ) যা স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের নিশ্চয়তা দেয় এবং একইসঙ্গে যৌনতা ও আবেগ উপভোগের ব্যবস্থা করে। বাৎসায়ন ভাষ্য (কামসূত্র ১-২০) অনুযায়ী 'অর্থ' বলতে অর্থকরী বিদ্যা অথবা বুদ্ধি সহ সোনা, গবাদি পশু, শষ্য ইত্যাদি পার্থিব সম্পদকে বোঝানো হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে মানুষের নিজের ও অপরের দুষ্কর্মগুলি মানব জীবনে অসুখী হওয়ার কারণ। বিশেষ করে আরো বেশি সম্পদ অর্জন ও পার্থিব আনন্দ লাভ করার আকাঙ্খার ফলস্বরূপ ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়।

আরো দেখা গেছে যে মানুষের আকাঙ্খা (কাম), অন্যান্য সহজাত আবেগ যেমন ক্রোধ (ক্রোধ) আসক্তি (মোহ) লালসা (লোভ) মোহাবিষ্ট (মদ) এবং শত্রুতা (মাৎসর্য) ইত্যাদির দ্বারাও প্রভাবিত হয়। এই ছয়টি সহজাত আবেগ মানুষের ষড় রিপু বলিয়া পরিগণিত হয়। সংযত করতে না পারলে এই রিপুগুলি মানুষের মনে কু-বুদ্ধির সঞ্চার করে অন্যের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে নিজের স্বার্থপর আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য প্ররোচিত করে। সাধারণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে মানুষের মন এই প্রকার ভুল কাজের প্ররোচক হিসাবে কাজ করে থাকে।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভুত চিরন্তন সমস্যা রোধ করে সুখ অর্জনের জন্য ধর্ম অথবা ন্যায় আচরণের নীতি তৈরী করা হয়েছিল। যখন মানুষ ধর্ম (শান্তি প্রভা ৫৯-১৪) অনুযায়ী আচরণ করে পরস্পরকে রক্ষা করত এরকম একটি আদর্শ ব্যবস্থার কথা আলোচনা করে ভীষ্ম বলেছিলেন যে মানুষ ধর্মের পথ থেকে বিপথগামী হয়ে ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার আসক্তি, কামনা ও লোভের দ্বারা চালিত হয় এবং বলবান মানুষরা বলহীন মানুষদের পীড়ন করতে আরম্ভ করে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ধর্ম, অর্থ এবং কাম (ত্রিবর্গ) নামে ত্রিমুখী আদর্শাবলী ভারতীয় জীবন দর্শণের আরম্ভ হিসাবে বিকশিত হয়েছিল।

মানব প্রকৃতি এবং সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে গভীর গবেষণার পর মহান ভবিষ্যত দ্রষ্টাগণ ঘোষণা করেছিলেন যে যদি না কামনা (আকাঙ্খা) সকল প্রকার পার্থিব অর্থাৎ বস্তুগত সন্তোষ (অর্থ) এবং ক্রোধ, লোভ, আসক্তি, মোহ ও ব্যক্তিগত শত্রুতাকে ব্যক্তি মানুষের শক্তি অথবা দুর্বলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রন না করে, নিয়মকানুনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা হয় তাহলে অবিরাম দ্বন্দ্ব এবং তার কারণ জনিত সুখ এবং শান্তির অভাব অবশ্যাম্ভাবি। এই উদ্দেশ্যেই জীবনের সকল দিক অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ধর্মের নিয়মাবলীকে পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছিল। এইভাবে কোন্‌গুলি আকাঙ্খা তার মধ্যে কোনগুলি গ্রহণযোগ্য বা বর্জনযোগ্য এবং কোনগুলিই বা সত্যিকারের কাঙ্খিত পার্থিব সুখ আহরণ করার প্রকৃত পন্থা সেই নিয়মগুলিই সামগ্রিকভাবে ধর্ম বলে পরিচিত। ধর্ম, অর্থ এবং কাম সমন্বিত ত্রিবর্গ মতবাদের উপর ভিত্তি করেই জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনের মূল বিষয়বস্তু বিকশিত হয়েছিল। ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে জনগণের স্বার্থের একটি ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য তৈরি করার জন্যই এই মতবাদ উদ্ভাবন করা হয়েছিল। যার অর্থ এই মতবাদ সকল ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত সমাজ অথবা জাতি এবং এমনকি সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছিল। অর্থ (সম্পদ), পার্থিব আনন্দ আহরণের আকাঙ্খা এবং কামনার উপর ধর্মের আধিপত্যের মাধ্যমে সুখ ভোগের অধিকার লাভ করা এবং তাকে রক্ষা করা ছিল এই মতবাদের উদ্দেশ্য, যা আগামীদিনের জন্য মানবজীবনের সকল সমস্যার একটি অমূল্য এবং চিরস্থায়ী সমাধানের পথ দেখায়। ধর্মের উপস্থাপনকারীরা নিজেরাই স্বীকার করেছিলেন যে আকাঙ্খা পূরণ মানব জীবনের একটি অপরিহার্য্য দিক এবং তাহা ব্যতীত মানবজীবন মূল্যহীন। তাঁরা অবশ্য এই মতও পোষণ করিতেন যে আকাঙ্খা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে, তার অনভিপ্রেত পরিণাম হতে বাধ্য। সেইজন্য ধর্মের উপস্থাপনকারীরা এই মত পোষণ করতেন যে একটি সুশৃঙ্খল সমাজের অস্তিত্ব সকলের শান্তি ও সুখ, পার্থিব উপভোগ এবং আনন্দলাভের আকাঙ্খা সব সময় ধর্ম (সঠিক আচরণবিধি) অনুযায়ী হওয়া উচিত এবং তা কখনই তার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত নয়। নিম্নোক্ত শ্লোকের সাহায্যে তার আরও সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ

धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थौ धर्म एव च ।
अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥
पतित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

অনেকে বলেন যে "মঙ্গল এবং সুখ আহরণের জন্য ধর্ম এবং অর্থই ভাল। আবার অন্য অনেকে মনে করেন যে অর্থ এবং কাম প্রবৃত্তি অধিকতর ভাল। তথাপি অনেকে ঘোষণা করেন যে ধর্মই সর্বোত্তকৃষ্ট।"

''এরকম ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা মনে করেন যে অর্থ একাই সুখ নিশ্চিত করতে সক্ষম। কিন্তু সঠিক মত এই যে ধর্ম, অর্থ এবং কর্মের (ত্রিবর্গ) সমন্বয়ই সুখ নিশ্চিত করে।

''যাই হোক, আকাঙ্খা (কামনা) এবং পার্থিব সম্পদ (অর্থ, অবশ্যই বর্জন করতে হবে যদি তা ধর্মের প্রতিকূল হয়। [মনু II-২২৪ এবং IV-১৭৬]

এই একটি পঙ্‌ক্তিতে বিশুদ্ধ বস্তুবাদ (অর্থ এবং কাম) এবং আধ্যত্মবাদের গুণাবলীর মূল্যায়ন করা হয়েছে। ধর্ম অর্থ এবং কর্মের সমন্বয় অথবা ত্রিবর্গ মতবাদ যা মঙ্গল ও সুখ নিশ্চিত করে। কিন্তু তা এই নীতির উপর ও প্রতিষ্ঠিত যে আকাঙ্খা (কামনা) এবং পার্থিব সম্পদ (অর্থ) পরিত্যাজ্য হবে যদি এরা ধর্মের সঙ্গে পরস্পর বিরোধী হয়। এদের অসামঞ্জস্য অসুখের কারণ। ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের মঙ্গল সাধন এবং সকলের সুখ নিশ্চিত করার জন্য 'ত্রিবর্গর' থেকে কোন ভাল নীতি বা দর্শন হতে পারে না। এটি ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সমাজের স্বার্থের সুসামঞ্জস্য বজায় রাখে।

এই মতবাদ অনুসারে অর্থ, যথা, পার্থিব সম্পদ এবং আনন্দ সংগ্রহ করার যথোচিত এবং আইন সম্মত উপায়গুলি নিশ্চিত ভাবে আকাঙ্খা (কাম) এবং পার্থিব আনন্দ (অর্থ) আহরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই মৌলিক নীতি ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনকে রক্ষা করার নিমিত্ত বিভিন্ন শর্তাবলীর মাধ্যমে নিজেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এই কারণেই ধর্ম নিয়ে সমস্ত গবেষণা একই ভাবে ঘোষণা করে যে, পৃথিবীকে যা রক্ষা করে তাই ধর্ম। সুখ ভোগের অধিকার রক্ষা ও বজায় রাখার জন্য ধর্মের উপযোগিতা, অর্থ এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আগেই যা বলা হয়েছে তা ভারতের সর্বোচ্চ আদালত নারায়ণ দীক্ষীতুলু বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার মামলায় [১৯৯৬ (৯) এস সি সি ৫৪৮ এ টি ৫৯০-৯১] পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্মের বিবর্তন হয়েছিল ব্যতিক্রম ভাবে সকলের সুখভোগের অধিকার লাভ করার জন্য। অধিক লোকের মঙ্গল বা সুখের জন্য অল্পসংখ্যক লোকের অশান্তি বা দুঃখ সৃষ্টি করা যেতে পারে এই ধারণা কোনদিনই ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতায় গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং সকল মানুষের সুখভোগের অধিকার একটি আদর্শ হিসাবে নথিবদ্ধ হয়েছিল। এটি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিনের প্রার্থনায় সংযোজন করা হয়েছিল ঃ

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चद्दुःखभाग्भवेत् ॥

''সকলে সুখে থাকুক
সকলে রোগ থেকে মুক্ত হোক
সকলের শুভ হোক
কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করে''

ছাত্রদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানদায়ী সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবলীর (শিক্ষা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ) মধ্যে সংকলিত হয়েছে।

सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः
शान्तिः शान्तिः

''ঈশ্বর যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করেন।
তিনি যেন আমাদের সকলকে পরিচর্যা করেন।
আমরা যেন একসাথে অসীম উৎসাহে কাজ করতে পারি

আমাদের শিক্ষা যেন শ্রমপূর্ণ এবং কার্যকরী হয়
আমরা যেন কাউকে ঘৃণা না করি
সকল সময় শান্তি, শান্তি এবং শান্তি বিরাজ করুক

সকলে শান্তি এবং সুখ ভোগ করুক এই আদর্শ এই প্রার্থনার মধ্যে নিহিত আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বিদায়ী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি উপদেশে এই একই উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় ছিল। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হল।

सत्यं वद। धर्मं चर ।
सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् ।
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।
अतिथिदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि ।
एष आदेशः । एष उपदेशः एतदनुशासनम् ।

সত্য কথা বল। নির্দেশিত আচরণবিধি অনুসরণ কর।
সত্যের প্রতি মনোযোগ দিতে বিরত হয়ো না।
কখনই কর্তব্য পালন করতে অপরাগ হয়ো না।
যা সঠিক এবং সত্য তাকে অশ্রদ্ধা কোর না।
তোমার পিতা, মাতা ও শিক্ষকদের সাথে দেবতার মত ব্যবহার কর।
অতএব, তোমার অতিথির সঙ্গে ও দেবতার মত আচরণ কর।
একমাত্র দোষমুক্ত কাজগুলি সম্পাদন করো এবং নিষিদ্ধ কাজগুলি করো না।
এটি একটি নির্দেশ, একটি উপদেশ এবং নিয়নুমাবর্তিতা (যা সারাজীবন মান্য করতে হবে।)

এই সকল প্রার্থনা এবং নির্দেশাবলীর উদ্দেশ্য ছিল প্রতি মানুষের অন্তরে এমনভাবে প্রভাব ফেলা যাতে সে সবসময় মনে রাখে যে প্রতিটি মানুষের সুখভোগের অধিকার আছে। সুতরাং তার কাজ, ব্যবহার অথবা নিজের আক্ষাঙ্খা পূরণের চেষ্টা এমন হবে না যা অন্যের সুখের বিনাশের কারণ হয়। অন্য ভাবে বলা যায় যে অন্য ব্যক্তিদের সুখ ভোগের অধিকার রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ধর্ম বা শ্রদ্ধা ভাবের বিকাশ ঘটানোই এই প্রার্থনা গুলির উদ্দেশ্য।

মহাভারতে ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন থেকে জানা যায় যে অতীতে, এমন কি রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে, এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা ছিল যেখানে ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার অন্যের দ্বারা রক্ষিত হত। পরবর্তী শ্লোক থেকে এটা বোঝা যায়।

नैव राज्यं न राजाऽऽसीन्न दण्डो न च दाण्डिकः ।
धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥

"তখন না ছিল রাজা, না ছিল রাজত্ব। ছিলনা শাস্তির কোন ধারণা বা শাস্তিযোগ্য অপরাধী। জনসাধারণ ধর্মের বিধান অনুযায়ী কাজ করত এবং এভাবেই একে অন্যাকে রক্ষা করত।"

৩০০ খ্রীষ্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ে লিখিত কৌটিল্যের* অর্থশাস্ত্রে সংযোজিত প্রাচীন ভারতের সাংবিধানিক আইন তথা রাজধর্মও সকল মানুষের সুখ ভোগ করার অধিকার এবং সেই অধিকার রক্ষায় রাজার কর্তব্যকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছে যা নিচের শ্লোকে প্রকাশ পেয়েছে।

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥
तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम् ।
अर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः ॥

'জনগণের সুখেই আছে রাজার আনন্দ।
জনগণের মঙ্গলই রাজার মঙ্গল।
নিজের স্বার্থের জন্য কোনকিছু করার চেয়ে
জনগণের স্বার্থের জন্য সামান্য কিছু করাকেই রাজা
ভাল বলে মনে করবে। (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পৃ-৩৯-৪২-এস)

রাজাকে তাঁর পছন্দ, অপছন্দ, বা খামখেয়ালিপনা ব্যতিরেকে রাজধর্মের উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করতে হত। রাজাকে খেয়ালখুশীমত বা স্বেচ্ছাচারীভাবে কোন কাজ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজা এবং নগরবাসীর স্বার্থ অবিভাজ্য ছিল। রাজার যতই অসুবিধা বা সমস্যা থাকুক না কেন জনগণের পক্ষে যা ভাল তাকেই শাসকের পক্ষে ভাল বলে গ্রহণ করতে হত। রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার আগে প্রত্যেক রাজকুমারকেই শপথ নিতে হত যে তিনি সম্পূর্ণভাবে ধর্মের বিধান মেনে রাজ্যশাসন করবেন। সকল মানুষকে সুখভোগ করার অধিকার দেওয়ার জন্য রাজার (রাষ্ট্রের) এই সকল কাজকে রাজধর্মই আবশ্যিক হিসাবে ঠিক করে দিয়েছে।

এই দর্শনের উৎপত্তিকাল থেকেই ধর্মের মূল নীতি হিসাবে মানুষের মেনে চলার স্বভাব প্রত্যেক ব্যক্তির মনে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল রাজপুত্রদের জন্য নির্দ্ধারিত আবশ্যিক শিক্ষার অংশ। এটিই চূড়ান্ত বিধিসম্মত ক্ষমতার অধিকার। রাজধর্মের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থেকে রাজধর্মে শাসকদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই রাজধর্মই তাঁদের ক্ষমতা ব্যবহারের দিক্ নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ করত। যখন আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সবেমাত্র তৈরী হওয়ার পথে তখন কিভাবে এই শক্তির অস্তিত্ব ছিল তা মহীশূর রাষ্ট্রের শাসকের ১৯২৭ সালের ৮ই আগস্ট দেওয়া একটি উদাহরণমূলক বার্তার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

কৌটিল্য মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন

मत्स्यन्यायाभिभूताः प्रजाः मनुं बैवरखत राजानं चक्रिरे ।
धान्यषड्भागं पण्यदशभागं न हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पनयामासुः ।
तेन भृता राजानः प्रजानां योगक्षेमवहाः ।

" সমাজে তখন "মাৎস্যন্যায়ের" অবস্থা। অরাজকতায় জর্জরিত মানুষ বৈবস্বত মনুকে তাদের রাজা বলে নির্বাচিত করেন। এবং সার্বভৌম ঋণ হিসাবে উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্ঠাংশ ও বাণিজ্যের এক দশমাংশ রাজাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অর্থ এবং শস্য ভোগ করার বিনিময়ে রাজারা নিজেরাই প্রজাদের রক্ষা ও নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (যোগক্ষেমবাহ)।"

''আজকের দিনে যখন আমি আমার শাসনকালের পঁচিশ বছর পূর্ণ করেছি তখন আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমার প্রতিটি প্রিয় জনগণের সুখ কামনায় আমার প্রেমময় অভিনন্দন জানাচ্ছি। যতদিন জীবন থাকবে ততদিন আমি অবিরাম প্রচেষ্টায় সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাব এবং আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমাকে জ্ঞান ও ক্ষমতা দান করার জন্য যাতে আমি আমার জীবনের এবং শাসনের সর্বোচ্চ এই উদ্দেশ্য সফল করতে পারি।''

এই কথাটি থেকে পরিস্কার দেখা যায় যে সুদূর অতীতে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুখ ভোগ করার অধিকারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুখ ভোগ করার অধিকার হল সুখ আহরণের জন্য নির্দিষ্ট সকল মানব অধিকারগুলির একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। এই কারণেই ''সর্বে জনা ঃ সুখিনো ভবন্তু'' অর্থাৎ 'সকল মানুষ সুখী হোক' এই উক্তিটি আমাদের সামাজিক এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থায় একটি বিশ্বস্ত নীতি রূপে পরিণত হয়েছে। যার অন্তর্গত হয়েছে কতকগুলি নির্দিষ্ট মানবাধিকার যা সুরক্ষায় সুখভাবের সৃষ্টি হয়।

কর্তব্য ভিত্তিক সমাজ
—মানব অধিকারের নিশ্চয়তা

এই দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির রূপকার মহান চিন্তাবিদেরা এক অনন্য পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন যা হল প্রতিটি ব্যক্তির অধিকারকে অপরের অনুরূপ কর্তব্য সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা। অধিকারবোধ সর্বদা স্বার্থপরতা থেকে উদ্ভুত হয়, পক্ষান্তরে কর্তব্যবোধ নিঃস্বার্থপরতার সৃষ্টি করে—তাঁদের এই ধারনাই উপরোক্ত প্রণালী সৃষ্টির কারণ। সেজন্য যে সব অধিকার বিবর্ধিত হয়েছিল সেগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এই মূল্যবোধ প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি অপর ব্যক্তির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত—যেমন সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য; পিতামাতার বার্ধ্যকের সময় পুত্র বা কন্যার কর্তব্য; ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের এবং শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের কর্তব্য ইত্যাদি। সকল কর্তব্য সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের মৌলিক অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য। কোন ব্যক্তির সহজাত কর্তব্য বোধ স্বভাবতঃই অন্যান্য ব্যক্তির অধিকার সৃষ্টি ও রক্ষা করে।

সেইজন্য অধিকারকে সামাজিক জীবনের ভিত্তি বলে গ্রহণ না করে অথবা অধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে এই দেশের প্রাচীন দার্শনিকগণ এমন একটি কর্তব্য ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া অধিকারের অর্থ হল তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনের অধিকার দেওয়া। সমগ্র প্রাচীন রচনায় জীবনের এই মৌলিক দিকটি সুস্পষ্টরূপে নির্দেশিত আছে। বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত একটি সমগ্র পরিচ্ছেদে এই দেশের ভৌগলিক সীমারেখা ও মৌলিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা আছে। আমাদের দেশে কর্তব্য বিষয়ক ধ্যানধারণা একটি শ্লোকের মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে ঃ

अत्रापि भारतं श्रेष्टं जम्बूद्वीपे महामुने ।
यतो हि कर्मभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः ॥

নানা দেশের মধ্যে ভারতকে মহান বলে মনে করা হয়। কারণ এই দেশ কর্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যা কিনা অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত 'ভোগসর্বস্ব' দেশগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত।

মহাত্মা গান্ধী এই আদর্শের উচ্চ প্রশংসা করে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন ঃ

''ভারত আমার কাছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় দেশ শুধু তা আমার নিজের দেশ বলে নয়, আমি তার মধ্যে পরম ধার্মিকতার সন্ধান পেয়েছি। ভারতের সবকিছু আমাকে আকর্ষণ করে। একজন উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তি যা কামনা করে, তাই সে এখানে পেয়ে থাকে। ভারত প্রধানতঃ এক 'কর্মভূমি' (কর্তব্যের দেশ), যা কিনা ভোগভূমির (উপভোগের দেশ) বিপরীত।'' (মাই পিক্চার অফ ফ্রি ইনডিয়া পৃ-১)।

এর তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দেশে বিকশিত সংস্কৃতি অনুযায়ী, প্রত্যেকেরই অপরের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে এবং এই মূল্যবোধের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তির অধিকার অন্যান্য ব্যক্তির কর্তব্যের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উল্লেখ করা দরকার যে পাশ্চাত্যের এক প্রখ্যাত সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডুগুইত (১৯৫৯-১৯২৮) এই তত্ত্বের প্রচার করেন যে মানুষের শান্তি এবং সুখের জন্য কর্তব্যভিত্তিক একটি সমাজের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন ঃ

"আইনের সারমর্ম নিহিত আছে কর্তব্যের মধ্যেই। কর্তব্যের দ্বারাই একজন ব্যক্তি সমাজের একাত্মতা বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। তিনি বলেছেন যে " মানুষের একমাত্র অধিকার হল কর্তব্য সম্পাদনের অধিকার। প্রচলিত অর্থে অধিকার হল অপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক, যা কেবলমাত্র একজনের সামাজিক কর্তব্য পালনের মাধ্যমে উদ্ভুত অতএব বাস্তব কোন অধিকার নয়, তা কর্তব্য মাত্র। (জুরিসপ্রুডেন্স-আর. ডব্লুউ. এম. ডায়াস)।

'কর্তব্যের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে অধিকার স্থাপন করা যায়'— এই মতবাদের সঙ্গে তিনি সহমত পোষণ করতেন না। পক্ষান্তরে 'কর্তব্যই অধিকারের ভিত্তি'— এই মতবাদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য আছে। বৈদিক এবং অন্যান্য সাহিত্যের মাধ্যমে বিকশিত জীবনের এই মৌলিক মূল্যবোধ ভগবদগীতার (দ্বিতীয় অধ্যায়) সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণায় সংযোজিত হয়েছে ঃ

कर्मण्येवाधिकारस्ते ।

"তোমার অধিকার হল তোমার কর্তব্য সম্পাদন করা।"

এই পংক্তিটির মহান বাণী হচ্ছে যে, প্রত্যেকেরই অপরের প্রতি কর্তব্য আছে এবং প্রত্যেকেরই কর্তব্য পালনের অধিকার আছে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই মানব অধিকারের সৃষ্টি ও সুরক্ষিত হয়েছে। বিশদভাবে বলা যায় যে শিক্ষার অধিকার এবং শিক্ষা প্রদানের অধিকার ব্যক্তির জ্ঞান আহরণ ও প্রসারণের মাধ্যমে 'ঋষিরুনা' পালনের মৌলিক কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক একইভবে নাগরিককে রক্ষা করার কর্তব্য, বিভেদ না করে সকলের সাথে সমান আচরণ করার কর্তব্য সকল ধর্মকে সুরক্ষা দেবার কর্তব্য, নারী ও শিশুদের রক্ষা করার কর্তব্য, নিরপেক্ষ বিচার সুরক্ষিত করার কর্তব্য ইত্যাদি সকল কর্তব্য শাসকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। এই সবেরই উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকের মূল্যবান মানব অধিকার ঘোষণা এবং রক্ষা করা।

এই মৌলিক মূল্যবোধ যা আমাদের জাতীয় পরিচয় ও স্বাতন্ত্রের ধারক, তাকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকেই উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী এটা আমাদের কয়েকটি জাতীয় সমস্যার প্রধান উৎস। কারণ, কর্তব্য সচেতনার পরিবর্তে শুধুমাত্র অধিকার সচেতনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যথাযথ শিক্ষা এবং পিতামাতা, শিক্ষক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত উদাহরণ ও আদর্শের মাধ্যমে শৈশবকাল থেকেই প্রত্যেকের মধ্যে কর্তব্যের ধারণা সৃষ্টি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মানবিক অধিকার সুরক্ষিত করার এটি একটি মহত্তম নিশ্চয়তা। এটি যেমন একদিকে বহু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেকের মানবিক অধিকার সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করতে এবং কর্তব্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে আরও বর্ধিত করতে সক্ষম হয়।

সাম্যের অধিকার

সাম্যের অধিকার সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। সাম্যের অধিকার ছাড়া সুখী হওয়া অসম্ভব। অন্যায় ভেদাভেদ জ্ঞান বৈষম্যের শিকার হওয়া মানুষের কষ্ট ও অশান্তির কারণ হয়। প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেইজন্য প্রাচীনকাল থেকেই মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্য এবং সমান সুযোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

বেদকে ধর্মের মৌলিক উৎস বলে গণ্য করা হয়, সাম্যের সনদ, প্রাচীনতম বেদ ঋগবেদ এবং অথর্ববেদেও সাম্যের সনদ সংযোজিত হয়েছে। সেগুলি উদ্ধতিযোগ্য।

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते ।
सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय ॥

"কেউ শ্রেষ্ঠ নয় আবার কেউই ক্ষুদ্র নয়। সকলেই ভ্রাতৃসম। সকলের স্বার্থরক্ষার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। সকলকে যৌথভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতেহবে।" (ঋগ্বেদ-মন্ডল-৫ সূক্ত-৬০ মন্ত্র-৫)

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

"তোমার সঙ্কল্পে, হৃদয়ে ও মনে যেন এককত্ব থাকে। সকলের মধ্যে যেন পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে জীবন ধারনের শক্তি অটুট থাকে।" (ঋগ্বেদ মন্ডল-১০,সূক্ত-১৯১, মন্ত্র-৪)

समानी प्रपा सह वोन्नभागः ।
समाने योक्त्रे सहा वो युनज्मि ।
आराः नाभिमिवाभितः ॥

"খাদ্য এবং পানীয়ের উপর সকলের সমান অধিকার আছে। জীবন রথের জোয়াল সকলের কাঁধে সমানভাবে চাপানো আছে। রথচক্রের শিক যেমন চক্রের পরিধির সঙ্গে নাভিকে সংযুক্ত রাখে, তেমনই সকলকে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল থেকে সম্পৃক্তির সঙ্গে জীবন যাপন করতে হবে।" (অথর্ববেদ-সমজ্ঞান সূক্ত)

এইভাবে বেদে সকল মানুষের সমতার অধিকারগুলি উল্লিখিত আছে। এই অধিকারগুলি অলঙ্ঘ্য বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ব্যক্তি মর্যাদাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে সকলেই যেহেতু ঈশ্বরের সন্তান তাই সকলেই ভ্রাতৃসম। কেউ বড় বা কেউ ছোট নয়। অথর্ববেদে একইভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সকলের সমান অধিকার আছে এবং সমাজে প্রত্যেকের সমান গুরুত্ব আছে। ঋক্ এবং অথর্ব— উভয় বেদই ঘোষণা করে যে সুখ ও প্রগতির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। লক্ষ্যনীয়, যে রাষ্ট্র তৈরী হওয়ার অনেক আগেই সমতার অধিকারকে ধর্মের অংশ হিসাবে গন্য করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে মানব অধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার (১৯৪৮) ১ নং ও ৭ নং ধারার সারবস্তু উল্লেখ করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে,

"সকল মানুষ স্বাধীনতা, সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে, মানুষ তাঁর প্রাপ্ত যুক্তি ও নীতিজ্ঞানের সাহায্যে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করবে।"

"আইনের চোখে সকলে সমান। কোন রকম বৈষম্য ছাড়া সকলেই আইনের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার সমান অধিকারী। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করা হলে অথবা এই জাতীয় বৈষম্যে প্ররোচিত করা হলে সকলে সমভাবে তার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত হবার অধিকারী।"

এই ঘোষণার সঙ্গে ঋগ্‌বেদে ঘোষিত সাম্যের নীতির সাদৃশ্য আছে।

রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই সাম্যের অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব শাসকগোষ্ঠীর উপর ন্যস্ত করা হয় এবং তা রাজধর্মের তথা সংবিধানিক আইনের অংশরূপে পরিগণিত হয়।

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम् ।
तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम् ॥

"মাতা ধরিত্রী যেমন সকল প্রাণীকে সমানভাবে ধারণ করেন, রাজাও সেইভাবে কোন প্রকার বিভেদ না করে সকলকে সমানভাবে প্রতিপালন করবেন।" (মনু- II- ৩১)

অন্যভাবে বলা যায়। মা যেমন তাঁর সকল সন্তানের প্রতি সমান আচরণ করেন রাজাও তেমনি সকল নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ করবেন। লক্ষ করা যায় যে সকলের সাম্যের অধিকার নাগরিকদের প্রতি শাসকবৃন্দের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের দ্বারা সুরক্ষিত হয়। নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকার রক্ষার এই প্রাচীন পদ্ধতি আধুনিক সাংবিধানিক পদ্ধতির সমতুল্য। ভারতের সংবিধানের ১৪ নং ধারায় ব্যক্তির জন্য সমতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যাতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"ভারতের সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আইনের সমতা কিংবা আইনের দ্বারা প্রদত্ত সমান সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।"

যদিও ১৪ নং ধারা একথা বলে না যে সাম্যের অধিকার প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার তথাপি এই ধারায় বর্ণিত সমতার অধিকার সকলের মৌলিক অধিকার হিসাবেই বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রের কর্তব্য আইন অনুযায়ী সকলকে সমান সুরক্ষা প্রদান করা। রাষ্ট্রের এই কর্তব্য সৃষ্টির ফলেই ব্যক্তি সাম্যের অধিকার লাভ করবে। অনুমতি বা মৌল-সম্মতি নিয়েও এই অধিকার লঙ্ঘন করা যায় না। .... বনাম আই টি কমিশনারের মামলায় (এ আই আর ১৯৫৯ এস সি ১৪৯ এই ১ ১৫৮) নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ—

এই বিষয়ে ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয় সংবিধানের এই ধারাটি রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশ স্বরূপ, এবং এই ভাবে রাষ্ট্রের উপর আয়োজিত দায়িত্বের বাস্তবতাই মৌলিক অধিকারের মাপকাঠি— যা ভারতের সীমানার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি উপভোগ করতে পারে।" রাজধর্মে গৃহীত পদ্ধতিও একই রকম। সকল নাগরিককে সমানভাবে সুরক্ষা প্রদানের কর্তব্য রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করে এই পদ্ধতির সাহায্যে সকলের জন্য সমতার অধিকারের সৃষ্টি করা হয়েছে।

শিক্ষার অধিকার

পবিত্র দায়বদ্ধতার ধারণা এমন এক বিশিষ্ট পদ্ধতি, যার দ্বারা ব্যক্তি কতগুলি মূল্যবান মানব অধিকার, মানুষের কর্তব্য বোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি এবং সুরক্ষিত করার প্রয়াস করা হয়েছিল। বেদসমূহে নির্দেশ করা আছে যে, প্রতিটি ব্যক্তির তিনটি পবিত্র কর্তব্য পালন করা আবশ্যক। সাধু কর্তব্য পালনের এই পবিত্র দায়বদ্ধতার ধারণা জীবনের একটি অন্যতম মূল মূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এটি ধর্মের অংশবিশেষ, 'কৃতজ্ঞতা' থেকে উদ্ভূত। এতে প্রতিটি মানুষের সেই উৎসের প্রতি কর্তব্য থাকা উচিত যে উৎস থেকে সে সকলপ্রকার উপকার লাভ করছে এমনকি তার নিজের অস্তিত্বও সেই উৎস থেকে সঞ্জাত। বেদে উল্লিখিত তিনটি পবিত্র কর্তব্য হল (১) ঈশ্বরের প্রতি (দেবারুণা) (২) পিতামাতার প্রতি (পিত্রুরুণা) (৩) ঋষিদের, শিক্ষকদের, শিক্ষাবিদ্‌দের প্রতি (ঋষিরুণা)।

কার্যতঃ এই দেশে বিকশিত সমগ্র প্রাচীন আইন এই তিনটি ঋণ বা পবিত্র দায়বদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যিনি চার বেদের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন এবং যিনি ভগবতগীতা সম্বলিত মহাকাব্য মহাভারত রচয়িতা—সেই মহর্ষি ব্যাস মনে করেন যে, তিনটি পবিত্র দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণ ছিল না। তিনি চতুর্থ একটি পবিত্র বিধান সংযোজন করেছিলেন—সেটি হল মানব সমাজের প্রতি (মানবারুনা)। এই চতুর্থ পবিত্র দায়বদ্ধতার সংযোজন ব্যাসের শ্রেষ্ঠ অবদান।

মহাভারতের আদিপর্বে ১২০-১৭-২০ অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলিতে এই চারটি সাধু কর্তব্য নির্দেশের উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ

> **ऋणैश्चतुर्भिः संयुक्ता जायन्ते मानवा भुवि ।**
> **पितृदेवर्षिमनुजैर्देयं तेभ्यश्च धर्मतः ॥**
> **यज्ञैस्तु देवान् प्रीणाति स्वाध्यायतपसा मुनीन् ।**
> **पुत्रैः श्राद्धैः पितृंश्चापि आनृशंस्येन मानवान् ॥**

"প্রতিটি ব্যক্তিকে যে চারটি পবিত্র দায় পালন করতে হবে, সেগুলি হল–– দেবারুণা, (ঈশ্বরের প্রতি), পিত্রুরুণা (পিতামাতার প্রতি), ঋষিরুণা (শিক্ষকের প্রতি), এবং মানবারুণা (মানবতার প্রতি)।

পিত্রুরুণা পালন করতে হয় সংসারের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, দেবারুনা ঈশ্বরের আরাধনার সাহায্যে, ঋষিরুণা জ্ঞান আহরণ ও বিস্তারের দ্বারা এবং মানবারুণা পালন করতে হয় সব ধরণের সমাজ সেবার মাধ্যমে।"

জীবনের মূল্যবোধগুলির মধ্যে সর্বা পেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ হল 'কৃতজ্ঞতা বোধ'। এই কৃতজ্ঞতা বোধকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই চারটি পবিত্র বিধান। দেবারুণা পালন করার জন্য নিজের পছন্দ অনুযায়ী যে কোন ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা, পিত্রুরুণা পালন করার জন্য সন্তান প্রজনন, শিক্ষাপ্রদান ও সমাজের সম্পদ হিসাবে তাদের রেখে যাওয়া আবশ্যক। এই চারটি সাধু কর্তব্যের মধ্যে তৃতীয় কর্তব্য 'ঋষিরুণা' - আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই সাধু কর্তব্য অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তিকে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই জ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংযোজন করে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য সুখ নিশ্চিত করতে হবে।

পূর্বতন যুগের গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌রা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানের যে সুরক্ষা, উন্নতি ও বিস্তার করেছিলেন, সেই ঋণ পরিশোধ করা পরবর্তী প্রজন্মের অবশ্য কর্তব্য। সংসারের মঙ্গলসাধনের জন্য পিতার নেওয়া ঋণ সুদসহ পরিশোধ করা যেমন পুত্রের কর্তব্য, তেমনি পবিত্র দায়বদ্ধতার নিরিখে প্রতিটি মানুষের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হল অর্জিত জ্ঞানকে সংরক্ষণ এবং তাকে আরো উন্নত করে তা পরবর্তী যুগের মানুষের মধ্যে বিতরণ করা এবং গবেষণা, ভাষ্যদান, শিক্ষাপ্রদান, পুস্তক রচনা ও নতুন নতুন ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে উন্নত করা। সেইজন্য প্রতিটি মানুষের সম্যক শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণ করা কর্তব্য। প্রত্যেককে প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চস্তরে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রভূত চেষ্টা করতে হবে।

অর্থ উপার্জন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে করা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে বিত্তবান হওয়া যায়। চুরি, জোচ্চুরি, প্রতারণা, আত্মসাৎ প্রভৃতি সহজ পন্থাতেও অর্থ উপার্জন করা যায়। কিন্তু জ্ঞান অর্জন সহজ উপায়ে হয়না। কঠোর অধ্যয়ন, নিষ্ঠা, মনসংযোগ এবং কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়েই জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। কোন সহজ কিংবা সন্দেহজনক পথে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। পরীক্ষায় কিংবা তার পরে অসদুপায়ে বা অন্য কোন পথ অবলম্বলন করে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি হয়তো সংগ্রহ করতে পারে, যা দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে ঘটছে, কিন্তু এই উপায়ে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে হয়তো তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি জোগাড়ে সফল হতে পারে, কিন্তু এইভাবে জীবনে সাফল্যলাভ করতে পারবে না। অর্থাৎ তাদের পেশায় তারা ব্যর্থ হবে। কোনভাবেই তারা সমাজের কোন উপকারে বা কাজে লাগবে না। এমনকি সমাজের পক্ষে তারা ক্ষতিকারক। এই দিকটিই নিম্নলিখিত শ্লোকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

सुखार्थी त्यजते विद्या विद्यार्थी त्यजते सुखम् ।
सुखार्थिनः कूतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ॥

"তুমি যদি বিলাসী ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে চাও তাহলে জ্ঞানার্জনের আকাঙ্খা ত্যাগ কর।"

"তোমার যদি বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জনের অভিলাষ থাকে, তাহলে ছাত্রজীবনে বিলাস ও আরামপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য লালায়িত হয়ো না।"

"যে বিলাসে আকৃষ্ট হয় এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য সহজ পন্থা বেছে নেয় তার কোন ভবিষ্যত নেই।"

"জ্ঞান অর্জনে যার আকাঙ্খা, তার বিলাসী এবং স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের কোন সুযোগ নাই।"

প্রকৃতই এটা কতখানি সত্য যে ছাত্রের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা আছে তাকে মনসংযোগসহ কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। একজন মানুষ পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করে (পিত্রার্জিত) কিংবা অন্য কোন সহজতর উপায়ে ধনী হতে পারে বা অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এটি অবশ্যই কেবলমাত্র স্বোপার্জিত হতে হবে (স্ব-অর্জিত)।

সন্তান সন্ততিদের জ্ঞানবান করে তোলা প্রতিটি ব্যক্তির দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা শুধু প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেই নয়, জীবনের সকল স্তরে এবং বয়সে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে পিতামাতাকে নজর দিতে হবে। কিন্তু প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষকদের দায়িত্বের বোঝা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। শুধু জ্ঞান বিতরণই নয়, ব্যক্তির চরিত্র গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্জিত জ্ঞান সমাজের মঙ্গলের কাজে লাগে। এটা সন্তোষের বিষয় যে শিক্ষকদের প্রতি পবিত্র কর্তব্য নির্দেশ (ঋষিরুণা) এই দেশে হাজার হাজার বছর ধরে পালিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিস্তৃত জ্ঞান ভাণ্ডারের বিকাশ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাচীন সমাজ এই কর্তব্য পালনে ঈর্ষনীয় ভূমিকা পালন করেছে, যার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে অগণিত মহামূল্যবান চিরকালীন সাহিত্যকর্মে।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার উপর কি ধরণের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি ভর্তৃহরির নিম্নলিখিত শ্লোক থেকে বোঝা যায় ঃ

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकंप्रच्छन्नगुप्तंधनं

विद्याभोगकरीयशः सुखकरीविघागुरूणांगुरूः ।

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विघा परं दैवतं

विद्या राजसूपूजितानतु धनं विज्ञाविहीनः पशुः २०

"শিক্ষা মানুষের বিশেষ প্রকাশ,

শিক্ষা এমন এক সম্পদ যা চুরি যাওয়ার ভয় থাকে না;

শিক্ষা পার্থিব আনন্দ, সুখ এবং খ্যাতি আনে;

শিক্ষা শিক্ষকের শিক্ষক;

প্রবাসে শিক্ষা ব্যক্তির বন্ধু;

শিক্ষা ঈশ্বরস্বরূপ,

শিক্ষাই রাষ্ট্রে সমাদৃত হয়, অর্থ নয়;

একজন অশিক্ষিত মানুষ পশুর সমান।"

উপরোক্ত পংক্তিতে উজ্জয়িনীর দার্শনিক রাজা ভর্তৃহরি শুধুমাত্র শিক্ষার গুরুত্বকেই তুলে ধরেননি উপরন্তু, অশিক্ষিত মানুষকে পশুর সঙ্গে এক করে দেখিয়েছেন। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি জ্ঞান অর্জন ও পরবর্তী প্রজন্মকে জ্ঞান বিতরণের পবিত্র দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেছেন। আমাদের সভ্যতার এই দিকটি ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। মোহিনী জৈনের মামলায় (এ আই আর ১৯৯২ এস সি ১৮৫৮, এ টি ১৮৬৬) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতির ঘোষণার প্রসঙ্গে বলেছেন,

"ভারতীয় সভ্যতায় শিক্ষা মানব সমাজের একটি অন্যতম সাধু কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন একটি ধর্মীয় ও দানশীল কাজ বলে গন্য। ভারতবর্ষে শিক্ষাকে কখনই বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়নি।" (১৮ নং অনুচ্ছেদ)।

শিক্ষার অধিকারকে সংবিধানের ২১ নং ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারের অংশ হিসাবে দেখাতে গিয়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় উন্নিকৃষান এর (এ আই আর ১৯৯৩ এস সি ২১৭৮) মামলায়, ভর্তৃহরির (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং ভর্তৃহরি রচিত উল্লেখিত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করে সার্বিক শিক্ষার গুণগান করেন। "সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আরও বলেন ঃ—

"বন্ধুয়ামুক্তি মোর্চা (এ আই আর ১৯৮৪ এস সি ৮০২) মামলায় এই আদালত অভিমত দেন যে ২১ নং ধারায় উল্লিখিত জীবনের সুরক্ষার অধিকারের মধ্যে শিক্ষালাভের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধালাভের অধিকারটিও নিহিত আছে।" (প্রাসঙ্গিক অংশটি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)। ব্যক্তি ও জাতির জীবনে শিক্ষার মৌলিক তাৎপর্য অনুধাবন করে এবং এই ন্যায়ালয়ের পূর্ব প্রদত্ত অভিমতের যুক্তি বিবেচনা করে আমরা বন্ধুয়ামুক্তি মোর্চার মামলার বিবৃতির সঙ্গে সহমত পোষণ করি এবং মনে করি ২১ নং ধারায় প্রদত্ত জীবনের অধিকারের মধ্যে শিক্ষার অধিকার নিহিত আছে, হাজার হাজার বছর ধরে শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয় সারা বিশ্বে ব্যক্তিজীবনে শিক্ষার অধিকার একটি অতীন্দ্রিয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে"। ভর্তৃহরি (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) তাঁর 'নীতিশতকম্' এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

''প্রকৃতপক্ষে, চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত অন্তত তিনটি ধারা ৪১,৪৫ এবং ৪৬ এ শিক্ষার অধিকারের উল্লেখ আছে। বারংবার এই অধিকারের উল্লেখের মধ্য দিয়ে সংবিধান সৃষ্টিকর্তারা শিক্ষার অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছিলেন। এমনকি দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিছু কিছু ধারায় যেমন, ২৯ এবং ৩০ এ শিক্ষার কথা বলা হয়েছে''। (১৪২ অনুচ্ছেদ)

এইভাবে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের সাহায্যে ঋষিরুণার পবিত্র দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষিত হয়েছে। শিক্ষার এই সাধু কর্তব্য পালনের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষার অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। রাষ্ট্র কেবলমাত্র শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে গুরুকুল প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করত। সংস্কৃত এবং অন্য ভাষায় অসংখ্য লেখা আছে, যেখানে ছোটদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক ও পিতামাতার কর্তব্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমনকি এও বলা হয়েছে যে, শিক্ষক বা পিতামাতা এই বিষয়ে অকৃতকার্য্য হলে তাকে কর্তব্যের প্রতি অবহেলা বলে গণ্য করা হবে।

ডঃ এস রাধাকৃষ্ণান তাঁর রচিত ''দি প্রিন্সিপাল উপনিষদ'' গ্রন্থে তৈত্তিরীয় উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পতঞ্জলি উদ্ধৃত করে বলেছেন,

''পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে (কিল্‌হরন সম্পাদিত, পৃষ্ঠ-৬) বলেছেন যে, চারটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়।

> প্রথম যখন আমরা শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করি;
> দ্বিতীয় যখন আমরা অধ্যয়ন করি;
> তৃতীয় যখন আমরা এই অর্জিত বিদ্যা অন্যদের দান করি;
> চতুর্থ যখন আমরা অর্জিত বিদ্যা প্রয়োগ করি।''

পতঞ্জলি এই সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ প্রবন্ধের সাহায্যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞান আহরণের চারটি পর্যায়ের নির্দেশ করেছেন।

(ক) তোমরা পিতামাতা বা শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান অহারণ কর;
(খ) নিজে অধ্যয়ন করে জ্ঞান বৃদ্ধি কর;
(গ) অর্জিত বিদ্যার সাথে মূল্যবান সংযোজন করে অন্যকে অর্থাৎ, পিতামাতা রূপে সন্তানকে, শিক্ষক রূপে অন্যদের বিদ্যা দান কর। এবং—
(ঘ) বৃত্তি, পেশা বা চাকরীর মাধ্যমে নিজের সংসারের এবং সমাজের উপকারের জন্য তোমার অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার কর।

শিক্ষার এই চারটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই সকলকে স্মরণে রাখতে হবে। শিক্ষকের নিকট জ্ঞান অর্জন করা ছাড়াও সারাজীবন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থেকে শিক্ষার প্রসারণ করতে পতঞ্জলি উপদেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষা যাতে বিনষ্ট না হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের উপকারের জন্য সংরক্ষিত হয় সেই উদেশ্যে পতঞ্জলি সকলকে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিদ্যা বিতরণের উপদেশও দিয়েছেন। জ্ঞান বিতরণের জন্য পেশাগত যোগ্যতার প্রয়োজন। সেজন্য চিকিৎসক, আইনজীবি, শিক্ষক, হস্তশিল্প কারিগর প্রভৃতির সাধু কর্তব্য হল তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান সমাজের পরবর্তী প্রজন্মকে বিতরণ বা দান করা। এটি একটি 'আন্তঃ প্রজন্ম মূলক' দায়বদ্ধতা। এ থেকে দেখা যায় চিকিৎসক, ব্যবহারজীবি, বাস্তুকার, কারিগর প্রভৃতি সকলেরই সামাজিক কর্তব্য হল কনিষ্ঠদের প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করা, যথাযথ শিক্ষাদান করা এবং পেশাগতভাবে তাদের সুযোগ্য করে তোলা। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু অর্জিত জ্ঞান বা পেশাগত দক্ষতা মানুষের উপকারের জন্য ব্যবহৃত না হলে সেই শিক্ষা বা দক্ষতা নিরর্থক। এই কারণে প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজ নিজ পেশা বা বৃত্তির সাহায্যে সমাজকে সেবা করা।

যেহেতু শুধুমাত্র শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি উন্মোচিত হয় এবং একটি আদর্শ জীবনযাপনে সে সক্ষম হয় সেহেতু ব্যক্তির সাধু কর্তব্য পালনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সর্বজ্ঞ নারায়ণের হিতোপোদেশে জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা ছাড়াও সন্তানের শিক্ষাদানে পিতামাতার কর্তব্যের বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে নীচের শ্লোকে ঃ

मातापितृकृताभ्यासो गुणीतामेति वाहकः ।
न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पण्डितः ॥ ३७ ॥
माता शत्रुः पिता बैरी येन बालो न पाठितः ।

"পিতামাতার দ্বারা শিক্ষিত বালক গুণসম্পন্ন হয়। জন্মসূত্রে কোন পুত্র বিদ্বান হতে পারে না।"

"পিতামাতা কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে পুত্রের কাছে পিতা-মাতা শত্রু হিসাবে পরিগণিত হয়।"

উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষাদান করা পিতামাতার একটি পবিত্র কর্তব্য। দুভাবে তাঁরা এই কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন। প্রথমতঃ প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরে মুখে মুখে মানব জীবন, প্রকৃতি ও নৈতিকতা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান দান করা এবং দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে উপরোক্ত শ্লোকে পিতামাতার প্রতি নির্দেশিত সতর্কিকরণ যথার্থ এবং সুদৃঢ়।

হিতোপোদেশে আরও একটি শ্লোক আছে, যেখানে শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् ।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम् ॥

শিক্ষা বৌদ্ধিক সংস্কৃতি দান করে; এই সংস্কৃতি যোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব প্রদান করে; যোগ্যতা ও স্থায়িত্ব সম্পদ আহরণে সাহায্য করে; সম্পদ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান করে; ধর্ম সুখ আনে।"

একটি সুবচনে শিক্ষার চিরন্তন মূল্যকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

अन्नदानात्परं दानं विद्यादानमतः परम् ।
अन्नेन क्षणिका तृप्तिर्यावज्जीवं च विद्याया ॥ २१७ ॥

অন্নদান অপেক্ষা বিদ্যাদান অধিকতর মূল্যবান। কেননা খাদ্য থেকে প্রাপ্ত সন্তুষ্টি স্বল্পস্থায়ী, অন্যদিকে বিদ্যা থেকে প্রাপ্ত সন্তুষ্টি সারাজীবনের সম্পদ।

অভাবগ্রস্তকে অন্নদানের প্রয়োজনীয়তাকে হেয় করার জন্য খাদ্য ও শিক্ষার এই তুলনা করা হয় নি। বরং এই তুলনার সাহায্যে এই প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে যে জ্ঞান বিতরণের ফলে দাতার কিছুই হারায় না বরঞ্চ গ্রহীতা বিদ্যার চিরকালীন উপকার লাভ করে সমাজের সম্পদে পরিণত হয়।

যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষাকে সাধু কর্তব্যের মধ্যে সংযুক্ত করে সম্ভবতঃ শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত করা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের একটি অন্যতম মহামূল্যবান অবদান। 'গুরুকুল' পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও অবাণিজ্যিক প্রচেষ্টায় সমাজের মঙ্গলের জন্য বিদ্যাদান করা হত। এই ব্যবস্থায় গুরু তাঁর শিষ্যদের জ্ঞান বিতরণ ছাড়াও নীতিশিক্ষাও প্রদান করতেন। শিক্ষকের উচ্চস্তরের নৈতিক চরিত্র ছাত্রদের উপর চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করত। এজন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের অন্তর্গত শিক্ষাসংক্রান্ত অধ্যায় 'শিক্ষাবলী'তে প্রতিটি ছাত্রকে তাঁর শিক্ষকের (আচার্য) প্রতি ঈশ্বরসম

আচরণ করতে বলা হয়েছে। অধিকন্তু, বিদ্যাভ্যাস শুরুতে ছাত্রদের যে বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করতে হত সেই শ্লোকে শিক্ষকের (গুরু) গুরুত্বের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। শ্লোকটি নিম্নরূপ ঃ—

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्बिष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर: ।

गुरु साक्षात् परंब्रह्मा तस्मैश्री गुरवे नम: ॥

"গুরুই ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা) তাঁকে প্রণাম।

গুরুই বিষ্ণু (ত্রাতা), গুরুই প্রভু পরমেশ্বর (পালনকর্তা)।"

গুরুর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিদ্যা বা জ্ঞান আহরণের গুরুত্বকেই প্রতিভাত করে।

বর্তমানে অক্ষর জ্ঞানের শতকরা হিসেবের উপর ভিত্তি করে শিক্ষিতের শতকরা হার নির্ণয় করার পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা এবং অক্ষর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ভুল। আমাদের দেশে এটি প্রকৃত সত্য এবং সন্দেহাতীত যে নিরক্ষর ব্যক্তি মাত্র অশিক্ষিত নয়। শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য এক বা একাধিক ভাষা পড়তে ও লিখতে পারা অবশ্যই অপারিহার্য্য। কিন্তু নিরক্ষর হয়েও কোন পুরুষ বা নারী শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত হতে পারে। সকলেই এব্যাপারে অবগত যে সমাজের সর্বস্তরে এমন অনেক পিতামাতা, প্রধানতঃ মাতা ছিলেন যাঁরা নিরক্ষর হয়েও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের জ্ঞান বিতরণ ও নীতিশিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম ছিলেন। নিরক্ষর হয়েও এই সকল পিতামাতার অনেকেই তুলসীদাসের রামায়ণ, ভগবদগীতা, তিরুক্কুয়াল অথবা বাসবেশ্বর তিরুভালুবার অথবা মহারাষ্ট্রীয় সন্তগণ ইত্যাদির বাণী মহারাষ্ট্রে মুনিঋষিদের বাণী ইত্যাদি সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যে কর্মের বাণী আবৃত্তি করতে পারা ছাড়াও এই সব সাহিত্যকর্মের অন্তর্নিহিত জীবনের মূল্যবোধগুলিও ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কারণ, বর্তমান সময়ের মত তখন মুদ্রণশিল্প, কাগজ বা লেখার ও মুদ্রণের সরঞ্জাম এত উন্নত ছিল না। বর্তমানে বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত না হয়েও কোন ভাষা পড়তে লিখতে কিংবা নিজের স্বাক্ষর করতে পারেন।

অতএব প্রকৃত শিক্ষা এবং কেবলমাত্র অক্ষর জ্ঞানের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। শুধুমাত্র সাক্ষরতা নয়। সুশিক্ষিত করে তোলাই হবে জাতির লক্ষ্য। কোন জাতির বা সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধির পরিমাণ সেই জাতির প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত ব্যক্তির সমানুপাতিক। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মাগান্ধীর অভিমত খুবই মূল্যবান।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর "ভারত এবং তাহার সমস্যাবলী" প্রবন্ধে বিষয়টি এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন

"শিক্ষা কি? ইহা কি কেবল পুঁথিগত বিদ্যা? না ইহা কি বহুমুখী জ্ঞান? না তাহাও না। যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছার প্রবাহ ও প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং ফলপ্রসূ হয় তাকেই শিক্ষা বলা হয়। প্রকৃত শিক্ষা কেবল শব্দ সমষ্টির সংকলন নয় অথবা সঠিক ও দক্ষ ভাবে ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তি প্রকাশের প্রশিক্ষণ নয়। প্রকৃত শিক্ষাকে ধীশক্তির বিকাশ রূপে বর্ণনা করা যায়।"

"সকল বিদ্যা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষ তৈরী করা। শিক্ষা সারাজীবন ধরে হজম না হওয়া তথ্যরাজি নয় যা মস্তিক তোলপাড় করে প্রবেশ করিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করাকে শিক্ষা বলা যায় না। আমাদের প্রয়োজন এমন জীবন মনুষ্যত্ব ও চরিত্র গঠনকারী ধারনা আত্মস্থ করা । পাঁচটি আদর্শ উপলব্ধি করে সেইগুলির সাহায্যে তোমার জীবন ও চরিত্র গঠন করতে পারলে তুমি যে শিক্ষা আয়ত্ব করতে পারবে তা কোন ব্যক্তির একটি সমগ্র পাঠাগার মুখস্ত করার থেকেও অধিকতর হবে।"

"শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিমত 'গুরুগৃহবাস'। গুরুর ব্যক্তিগত জীবন ব্যতিরেকে শিক্ষা হয় না। বালক অবস্থা থেকেই এমন এক গুরুর সঙ্গে বাস করতে হবে যাঁর চরিত্র জ্বলন্ত পাবক শিখার মত এবং যিনি তার সামনে সর্বোচ্চ

শিক্ষাদানের জীবন্ত আদর্শ রূপে বিদ্যমান থাকবেন। আমাদের দেশে সর্বত্যাগী ব্যক্তিরা জ্ঞান দান করে থাকেন। জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব পুনরায় ত্যাগীদের স্কন্ধেই অর্পণ করতে হবে।''

''শিক্ষক কখনও নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জ্ঞান দান করবেন না, অর্থ, নাম অথবা খ্যাতির জন্যও নয়। তাঁর কর্ম বৃহত্তর মনুষ্য সমাজের নিমিত্ত নিখাদ ভালোবাসা থেকে উৎসারিত হবে।'' (ভারত এবং তাহার সমস্যাবলী, পৃ ৪০,৪৫,৪৬)

স্বাধীনতা অর্জনের পরে মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে আমাদের জাতির ভাগ্যে কি ঘটতে পারে মহাত্মাগান্ধী সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন,

''আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক পরেই দেশবাসী সুখ লাভে সক্ষম হবে না। আমরা স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের নির্বাচন পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি, অবিচার, ধনী সম্প্রদায়ের অত্যাচার তথা শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব ও গুরুভার অবধারিতভাবে আমাদের বহন করতে হবে। জনসাধারণ মনে করতে শুরু করবে যে অতীতের দিনগুলিতে স্বাধীনতা লাভের পরের দিনগুলির তুলনায় অধিকতর ন্যায়বিচার ও অপেক্ষাকৃত ভাল শাসনব্যবস্থা, অধিকতর শান্তি এবং শাসকদের মধ্যে অধিক সততা ছিল। স্বাধীনতা লাভের একমাত্র সুফল হল দাসত্ব ও তৎজনিত অপমানের কলঙ্ক থেকে মুক্তি। কিন্তু আশায় বুক বাঁধা যায় যদি সমগ্র দেশে শিক্ষার প্রসার হয়। এই শিক্ষার থেকেই মানুষ শৈশব থেকে নিজেকে উন্নত করতে, সুব্যবহারের গুণাবলী অর্জন করতে, ঈশ্বরকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে অভ্যস্ত হবে। আমরা যদি আমাদের এই কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারি তাহলেই স্বরাজ আমাদের সুখ প্রদান করবে। ভারত অন্যথায় শাসকগোষ্ঠীর তীব্র অবিচার ও অত্যাচারের বাসভূমিতে পরিণত হবে।'' (২৪/১/১৯৯২ তারিখের চিঠি হিন্দুস্থান দৈনিকে ১৫/৮/১৯৬৫ তারিখে পুনরায় প্রকাশিত)।

বর্তমান শতাব্দীর মহান ব্যক্তিগণ প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকারের গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে শিক্ষাদানের দায়িত্ব ত্যাগীরাই (নিঃস্বার্থ ব্যক্তি) বহন করবেন। এর প্রকৃত অর্থ, শিক্ষার দাবী পূরণে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন আদায় করে পরিচালনা করা যেতে পারে। কিন্তু কখনই এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা চলবে না। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন উপরোক্ত মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণ এইরকম বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, বিশেষতঃ বিগত দুই দশকে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে আমাদের দেশে শিক্ষার অধিকার সর্বাপেক্ষা মৌলিক মানব অধিকার বলে স্বীকৃত। এই অধিকারকে, মানব অধিকারের ঘোষণার ২৬ নং ধারায়, অন্যতম মানব অধিকার বলে গ্রহণ করা হয়েছিল এতে বলা হয়েছে ঃ-

''২৬ (১) প্রত্যেকেরই শিক্ষার অধিকার আছে। অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং আবশ্যিক করতে হবে। মেধার ভিত্তিতে কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা এবং উচ্চতর শিক্ষার সুযোগও সমানভাবে প্রদান করতে হবে।

(২) শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন এবং মানব অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাভাব বৃদ্ধি করা। শিক্ষা সকল জাতির ও ধর্মের মধ্যে বোঝাপড়া, সহনশীলতা ও সমতা প্রসার করতে এবং শান্তি রক্ষার কাজে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্রিয়াকর্মকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।''

উন্নিকৃষানের মামলায় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় রায় দিয়েছেন যে, ২১ নং ধারায় সংযোজিত জীবন ও স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষার অধিকার, বিশেষতঃ চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার, অন্তর্ভুক্ত আছে। ন্যায়ালয় বলেছেন ঃ

"৪৫ ও ৪১ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার অধিকার বলতে বুঝতে হবে (ক) দেশে প্রত্যেক শিশু নাগরিকের চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষালাভের অধিকার আছে, (খ) ১৪ বছর পরে তার শিক্ষার অধিকার রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও তার উন্নতির সীমার নিরিখে নির্ধারিত।" (অনুচ্ছেদ—১৪৫, পৃ: ২২৩২)

কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে রাষ্ট্র এইরকম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারকে সফলভাবে কার্যকরী করতে সমর্থ হয়নি। ভারত সরকারের প্রকাশিত "চ্যালেঞ্জেস ইন এডুকেশ্ন" নামক সরকারী প্রকাশন থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটি এইরূপ ঃ

"যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৫০ কোটি মানুষ নিরক্ষর থাকবে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ভায্য অনুযায়ী ঐ সময়ে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়স্কদের মধ্যে বিশ্বের ৫৪ শতাংশ নিরক্ষর ব্যক্তিই হবে ভারতের অধিবাসী।"

অর্থাৎ শিক্ষার অধিকার , যা একটি মৌলিক অধিকার, ভারতবর্ষে এখন ও যথাযথভাবে কার্যকরী করা যায় নি।

এই প্রসঙ্গে দিল্লী আদালতের সাম্প্রতিক একটি রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রায়ে প্রাক্-প্রাথমিক বিভাগে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিশু ও তার পিতামাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ঘোষণা প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষা প্রদানের সাধু কর্তব্য সম্পাদন করার পরিবর্তে প্রাথমিক ও প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও অর্থকরী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে ব্যর্থতাই বর্তমান অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী।

অর্থগৃধ্নু লোভী ব্যক্তিরা প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে ও মাত্ররিতিক্ত বেতন আদায় করে রাষ্ট্রের এই ব্যর্থতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার যদি মৌলিক মানব অধিকার হয় এবং তা যদি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহলে, প্রতিটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির অধিকারী। অতএব, প্রাথমিক স্তরে ভর্তির ব্যাপারে সাক্ষাৎকার ও নির্বাচনের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা দান করতে হবে। এই বিষয়ে সংবিধানের ৩৫০ক ধারা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। এই ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"৩৫০কঃ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুযোগ—সুবিধা প্রতিটি রাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উচিত ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থায় করা। রাষ্ট্রপতিও যে কোন রাজ্যকে এই সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারেন।" উপরোক্ত ধারাটি রাজ্য পুর্নগঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের মতে ভাষাগতভাবে রাজ্যগঠনের পরে স্বভাবতঃই যে কোন রাজ্যের অধিকাংশ শিশুদের জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। কমিশনের অভিপ্রায় ছিল যে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি সমভাবে প্রযোজ্য হবে। এই উদ্দেশ্যে ৩৫০ (ক) ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল।

ভাষাগত সংখ্যালঘু সুরক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বনাম কর্ণাটক রাজ্যের মামলায় (আই এল আর ১৯৮৯ কর্ণাটক ৪৫৭) কর্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয় নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ

"প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন যে শিশুরা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষালাভের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাবে। আগেই বলা হয়েছে যে ভাষাগতভাবে রাজ্য গঠনের প্রেক্ষাপটে রাজ্য পুর্নগঠন কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশনের দৃঢ় অভিমত এই যে মাতৃভাষার মাধ্যমে

প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য প্রতিটি ভাষাগত রাজ্যের উপর একটি সাংবিধানিক কর্তব্য অর্পণ করতে হবে। এই সুপারিশের আলোকে ৩৫০ (ক) ধারাটি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। শুধুমাত্র রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি প্রত্যেক রাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপরও এই কর্তব্য আরোপিত হয়েছে যে ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা তারা প্রদান করেবে।'' (পৃ ৫১১)

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রীদের পিতামাতার সংগঠন বনাম কর্ণাটক রাজ্যের মামলায় কর্ণাটক উচ্চ আদালতের রায় সমর্থন করেছেন। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় মনে করেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদান প্রসঙ্গে কর্ণাটক সরকারের নীতি সাংবিধানিকভাবে যথার্থ। প্রাসঙ্গিক বয়ানটি নিম্নরূপ ঃ

''শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিশেষজ্ঞ এই মত পোষণ করেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই ছাত্রদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। এই ধারণার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি ও ন্যায়বিচার আছে। কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা কৃত্রিম হতে বাধ্য। এই অবস্থা তাদের উপর নিষ্ঠুরভাবে মানসিক চাপের সৃষ্টি করে এবং ফলস্বরূপ, সমস্ত কাজটি যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। এছাড়া শিক্ষা প্রণালী কৃত্রিম ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়ে। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক জ্ঞান সহজেই বিকশিত হয়। বিদেশী ভাষার প্রবর্তন মাতৃভাষার বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।''

মহাত্মাগান্ধী বলেছেন ঃ

''শিক্ষার মাধ্যমকে এখনই যে কোন মূল্যে পরিবর্তন করতে হবে। প্রাদেশিক ভাষাকে তাদের যথাযথ স্থান দিতে হবে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ক্রমবর্ধমান জঘন্য অপচয় অপেক্ষা সাময়িক বিশৃঙ্খলা অধিকতর কাম্য বলে আমি মনে করি।''

মহাত্মাগান্ধী মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সমর্থনে বলেছেন যে তা শিশুর কাছে মাতৃদুগ্ধের ন্যায় প্রয়োজনীয়। উপরন্তু, সৎ ও সুষ্ঠুভাবে আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য নীতিশিক্ষার মাধ্যমে সৎ নাগরিক তৈরী করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্ভাগ্যক্রমে সংবিধানে ব্যবস্থা থাকা অথবা মহাত্মা গান্ধীর অভিমত এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ঘোষণা সত্ত্বেও প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি মোহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এইভাবে আইনকে অমান্য করা হচ্ছে। প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে নতুন ভাষা শিক্ষার কুফল স্বরূপ শিশু শক্তির অপচয় বন্ধ করতে, শিশুদের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক করে গড়ে তুলতে, প্রাথমিক শিক্ষাকে সকলের হিতার্থে পরিবেশন করতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। এই মর্মে জাতীয় নীতি নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষক সম্প্রদায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার ইত্যাদি সকলকেই অবিলম্বে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।

শিক্ষায় মানব অধিকারের উদ্দেশ্য হল সুখ নিশ্চিত করা। সেজন্য শিক্ষাকে শুধুমাত্র সাক্ষরতার গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। বৌদ্ধিক, মানসিক, নৈতিক, শারীরিক সর্বতোভাবে ব্যক্তির উন্নতি ও প্রত্যেককে সম্পদ হিসাবে তৈরী করাই শিক্ষার লক্ষ্য। যখন কোন জাতি কিংবা সমাজ যথেষ্ট সংখ্যক এই রকম ব্যক্তি তৈরী করতে সফল হয় তখনই ঐ জাতি বা সমাজ সুখ লাভ করতে সমর্থ হয়। এই বিষয়টি তৈত্তিরীয় উপনিষদের অন্তর্গত শিক্ষাবলীর অষ্টম অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত আছে ঃ

युवा स्यात्साधु युवाऽध्यायकः ।
आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः ।
तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पुर्णा स्यात् ।
स एको मानुष आनन्दः ।

"সুখ বলতে বোঝায় যে যুবসম্প্রদায় হবে উন্নত চরিত্র সম্পন্ন ও শিক্ষিত, দৃঢ় সঙ্কল্পমনা এবং নৈতিক ও শারীরিকভাবে শক্তিশালী। একমাত্র তখনই পৃথিবী সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে। ইহাই মানবজীবনে সুখের পরিমাপক।" এই শিক্ষা খুবই জ্ঞানদায়ী। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে শিক্ষার অর্থ বুদ্ধিগত, নৈতিক ও শারীরিক শিক্ষা। এই শ্লোকে আরও বলা হয়েছে যে কোন জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি তার শারীরিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তির সংখ্যার সমানুপাতিক। এই সকল ব্যক্তিরা উপরোক্ত গুণের অধিকারী হয়েছে প্রকৃত শিক্ষার সাহায্যে, যা জাতির সকলের সর্বতোভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তির চরিত্র গঠন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং যে পদ্ধতিতে এই চরিত্র গঠন করা হয় তাকে সংস্কার বলে। আদি শঙ্করাচার্য ও তাঁর শিষ্যরা এই পদ্ধতি নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

संस्कारो हि नाम गुणाधानेन वा स्याद् दोषापनयनेन वा ।

"সংস্কার হচ্ছে একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে উত্তম গুণগুলি গ্রহণ করা হয় এবং দোষ ত্রুটিগুলি বর্জন করা হয়।" (বেদান্ত সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য, ১-৪)

**संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाने पदार्थी भवति योग्यः
कस्यचिदर्थस्य ।**

"সংস্কার হচ্ছে একটি পদ্ধতি যা অবলম্বনে কোন ব্যক্তি বা বস্তু নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়।" (জৈমিনি- III (১) (৩) - র উপর সবরার টীকা, খন্ড ১, পৃ ৩৩৮)

**योग्यतां चादधानाः क्रियाः संस्कारा इत्युच्यन्ते ।
योग्यता च सर्वत्र द्विप्रकारा ।
दोषापनयनेन गुणान्तरोपजननेन च भवति ।**

"সংস্কার হচ্ছে সেই শিক্ষা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা কোন (ব্যক্তি বা বস্তুর) যোগ্যতা প্রদান করে। তা দু ধরণের উদ্দেশ্য সাধন করে। (১) ত্রুটি র অপসারণ, এবং (২) সদ্‌গুণের পরিচর্যা।" (কুমারিলা- তন্ত্রভর্তৃক ১১১৫)

অতএব সংস্কার একপ্রকার পদ্ধতি যার সাহায্যে ব্যক্তির শুদ্ধি, উন্নতি, গঠন ও শিক্ষা হয়। যাতে সে জীবনের সকল স্তরে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যোগ্য হয়। সংস্কারকে অন্যভাবে বলা যায় যে এটি এমন এক পদ্ধতি যার সাহায্যে শৃঙ্খলাবোধ, চরিত্র ও সদাচরণকে বদ্ধমূল করা হয় এবং এই পদ্ধতি অন্য সকল গুণ আহরণের সহায়ক হয়।

এটা পরিষ্কার যে সকলের জন্য অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে দেশের জন্য সুখ আহরণ করতে হলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয় উপরন্তু এমন এক মৌলিক শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন যার ফলে অধিকসংখ্যক চরিত্রবান, শিক্ষিত, দৃঢ়সঙ্কল্প ও নৈতিক ও শারীরিকভাবে পটু যুবক সৃষ্টি হতে পারে। জাতীয় সুখ-সমৃদ্ধি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত এইরূপ যুবকবৃন্দের সংখ্যার সমানুপাতিক হবে। এটা সর্বস্তরের সকল শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষকের এক পবিত্র দুর্বহ কর্তব্য।

সুরক্ষার অধিকার

রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং তার উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের কাছ থেকে ব্যক্তির সুরক্ষা পাওয়া। যার মাধ্যমে সকল ব্যক্তি সুখে বাস করতে পারে এবং সমাজে সুখশান্তি বিরাজ করতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে মহাভারতে রাজধর্ম বিষয়ক উপদেশাবলীতে উল্লেখ আছে যে এই দেশের সভ্যতা বিকাশের অতি প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং এই ধর্মপালন ছিল মানুষের এক স্বআরোপিত শৃঙ্খলাবোধ। ফলস্বরূপ, প্রত্যেকেই ধর্ম অনুযায়ী কাজ করত এবং আইন মানতে বাধ্য করার জন্য কোন অভিভাবকত্বের প্রয়োজন ছিল না। এইভাবে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বিরাজ করত।

এই ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। যখন থেকে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং ঈশ্বরের ইপ্সিত ফলদানের ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, এবং মানুষের ঈশ্বরের প্রতি ভীতিমূলক আচরণ সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করল তখন থেকেই প্রকৃত পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু হল। এক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যখন স্বার্থপর পার্থিব আকাঙ্খার বশবর্তী বলবান মানুষেরা তাদের স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল সম্প্রদায়কে শোষণ এবং উৎপীড়ন করতে শুরু করল। দুর্বলের প্রতি বলবানের স্বেচ্ছাচার অবাধ হল। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথে বাধা সৃষ্টি হল এবং ফলস্বরূপ ব্যক্তির জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে এই ব্যক্তিরা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করল। এভাবে সুখভোগের মূল মানব অধিকার ব্যাহত হল। এই অবস্থা আইনমান্যকারী মানুষদের সমাধান খুঁজতে বাধ্য করল। ফলস্বরূপ উদ্ভব হল রাজ প্রতিষ্ঠান এবং মানুষকে রক্ষা করার সর্বোচ্চ কর্তব্য। রাজ-পদ গ্রহণের আগে রাজারা তাঁদের শক্তির সীমাবদ্ধতা এবং কর্তব্য জানার জন্য কিভাবে উদ্‌গ্রীব থাকত তা জানা যায় রাজা ভীণা ঋষিদের কাছ থেকে রাজ-পদ গ্রহণের প্রাক্‌কালে যা জানতে পেরেছিল তা থেকে। (মহাভারত বি শান্তি পর্ব ৫৯, ১০৬-১০৭) ঋষিরা রাজাকে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ঃ

प्रतिज्ञां चधिरोहस्व मनसा कर्मणा गिरा ।
पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रहा इत्येव चासकृत् ॥
यश्यचात्र धर्मो नित्योक्तो दण्डनीतिव्यपाश्रयः ।
तमशंकः करिष्यामि खवशो न कदाचन ॥

(১) তুমি অবশ্যই ধর্ম অনুযায়ী রীতিবদ্ধভাবে এবং নির্ভয়ে কাজ করবে।

(২) অশুভ আকাঙ্খা, রাগ বা লোভের বশবর্তী না হয়ে অথবা নিজস্ব ব্যক্তিগত অহমিকার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অথবা তোমার নিজের সুখ বা দুঃখের জন্য কাজ না করে সকল মানুষকে সমানভাবে বিচার করবে।

(৩) আইন ভঙ্গকারীদের আইন অনুযায়ী শাস্তিদান করবে।

(৪) তুমি অবশ্যই প্রতিজ্ঞা করবে যে চিন্তায়, কথায় ও কাজে তুমি পৃথিবী শাসন করবে এই বিশ্বাসে যে সৃষ্টি হল মূর্তিমান সৃষ্টিকর্তা।

(৫) তুমি নিজেকে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা হওয়ার সুযোগ কখনই দেবে না।

রাজা ভীণার প্রশ্নর পরিপ্রেক্ষিতে ঋষিদের প্রদত্ত উপরোক্ত উত্তরগুলি থেকে নিম্নলিখিত আদর্শগুলি রাজার নিকট পেশ করা হয় ঃ—

(১) রাজার পছন্দ অনুযায়ী অনুশাসন নয় কেবলমাত্র আইনের অনুশাসনই বলবৎ থাকবে।

(২) কোন প্রকার পক্ষপাত অথবা প্রভেদ না করে রাজা প্রত্যেককে সমভাবে বিচার করবেন।

(৩) তাঁরা বিচার সম্পাদনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন।

(৪) নিজের ব্যক্তিগত ধারণা বা পছন্দের ভিত্তিতে নয়, রাজা দোষীদের একমাত্র আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করবেন।

(৫) রাজা অত্যাচারী হবেন না।

প্রাচীন ভারতের সাংবিধানিক আইন রাজধর্মের মাধ্যমে শাসনকর্তার উপর মানুষের উপর মানুষের রক্ষার কর্তব্য ন্যস্ত করে মানুষের সুরক্ষার অধিকার সৃষ্টি করেছিল। যাঁরা ভারত ভূখন্ডের যে কোন অংশে রাজত্ব করতেন। সকল শাসনকর্তার ক্ষেত্রেই কর্তব্য প্রযোজ্য ছিল, সেই রাজার কিছু কিছু কর্তব্যের কথা নিম্নোক্ত শ্লোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ঃ

दुष्टस्य दण्ड: सुजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च संप्रवृद्धि: ।
अपक्षपातोऽर्थिषु राष्ट्ररक्षा पञ्चैव यज्ञा: कथिता नृपाणाम् ॥

"দুর্জনকে শাস্তি দেওয়া, সজ্জনকে সম্মান (রক্ষা) করা, সৎ উপায়ে ধনভান্ডার (রাজকোষ) সমৃদ্ধিশালী করা, বিচারপ্রার্থীর কাছে নিরপেক্ষ হওয়া এবং রাজত্ব করা— এই পাঁচটি কর্তব্য (স্বার্থহীন) রাজাকে পালন করতে হবে।" (অত্রি - ২৮)

एवं चरन् सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिव: ।
हितेषु चैव लोकस्य सर्वान् भृत्यान् नियोजयेत् ॥

"রাজার নিজের আচরণ সবসময় রাজধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সকল ভৃত্যবর্গকে জনগণের হিতার্থে কাজ করতে আদেশ করতে হবে। [মনু IX ৩২৪]

क्षत्रियस्य परो धर्म: प्रजानामेव पालनम् ।
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥

রাজার সর্বোচ্চ কর্তব্য হল তাঁর প্রজাগণকে রক্ষা করা। যে রাজা নির্ধারিত খাজনা গ্রহণ করে (তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে) এবং তাঁদেরকে রক্ষা করে, একমাত্র সেই রাজাই ধর্ম অনুযায়ী কাজ করে। (মনু ১৪৩-১৪৪)

नृपस्य परमो धर्म: प्रजानां परिपालनम् ।
दुष्टनिग्रहणं नित्यं न नीत्या ने बिना ह्युमे ॥

রাজার সর্বোচ্চ ধর্ম হল প্রজাগণের রক্ষা এবং মঙ্গল সাধন করা এবং দুষ্টের দমন করা।(শুক্র I, ২৭-২৮)

মহাভারতে সন্নিবিষ্ট এই সমস্ত আদর্শাবলী ও রাজধর্মের বিষয়ে অন্যান্য রচনা প্রাচীন ভারতের প্রায় সমস্ত রাজাদের অনুপ্রাণিত এবং পথ নির্দেশ করেছে। তাঁরা অবধারিত ভাবেই এই সকল বিধান অনুযায়ী কাজ করে গেছেন। প্রজাগণের মধ্যে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বোধই ছিল রাজাদের যথোচিত কাজ পরিচালনার শেষ কথা। সাধারণভাবে ধর্মের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ছিল বর্তমান কালের লিখিত সংবিধানের সাংবিধানিক মাহাত্ম্যের অনুরূপ।

এই দেশে অতীতকালের অবস্থা বিশ্লেষণ করে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ

"শাস্ত্রে রাজার কর্তব্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা থাকত। সেই সময়ে একজন মানুষের সামাজিক মর্যাদা তাঁর ভোগ করার দিক থেকে যতটা না বিচার্য ছিল তার থেকে বেশী বিচার্য ছিল তাঁর কর্তব্য পালন। এর পশ্চাতে নৈতিক এবং ধর্মীয় সম্মতিও ছিল এবং সেকালে রাজা যদি তাঁর কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হত তাহলে বর্তমান যুগের জনগণের অধিকার লঙ্ঘনের মত উত্তেজনা সৃষ্টি হত। (প্রাচীন ভারত, পৃ ১৫৪-১৫৫)

এই দেশে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে রাজারা সাধারণভাবে ধর্মের উপর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ধর্মকে অমান্য করতে ভয় পেতেন এবং মানুষের মঙ্গল সাধনে তৎপর থাকতেন।

(১) জনগণের সুরক্ষা সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য

রাজধর্মের উপর গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য কমন্ডকেএকটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে যাতে ব্যক্তির প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করাকে রাজার সর্বোচ্চ কর্তব্য হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাকে আঘাত করা হয়েছে অথবা আঘাত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা সে যে কোন ব্যক্তিই হোক না কেন—এই বিষয়টি পরবর্তী শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ঃ

आयुक्तकेम्यश्चोरेभ्य: परेभ्ये राजवल्लभात् ।
पृथिवीपतिलोभाञ्च प्रजानां पञ्चधा भयम् ।
पञ्चप्रकारमप्येतदपोह्यं नृपतेर्भयम् ॥

"রাজার ধূর্ত আধিকারিকদের, চোরেদের, রাজার শত্রুদের, রাজার পছন্দের লোকেদের (যেমন রাণী, রাজপুত্রগণ ইত্যাদি) এবং সর্বোপরি রাজার নিজের লোভের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রয়োজন। প্রজাদের এ সকল ভয় থেকে রক্ষা করা উচিত। (কমন্ডক - V ৮২-৮৩)

এর থেকে স্পষ্ট হয় যে আইনই সর্বোচ্চ। কেউই এমনকি রাজাও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি তাঁর জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে দায়বদ্ধ। এই সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও আরও কিছু নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে যা মানুষের সুরক্ষার অধিকারের গুরুত্ব বিষয়ে অনেকাংশে আলোকপাত করে।"

(২) চুরি যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে মালিককে ফেরত দেওয়া বা এর তুল্য মূল্য প্রদান করা কর্তব্য ঃ

चौरैर्हनं प्रयत्ने खरूपं प्रतिपादयेत् ।
तदभावे तु मुल्यं स्यादन्यथा किल्बिषी नृप: ॥
लब्धेऽपि चौरं ˜मोषस्तस्मान्न लम्यते ।
दद्यात्तमथवा चौरं दापयेत्तु यथेष्टत: ।

"রাজা চুরি যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে তা মালিককে ফেরত দেবেন। যদি এই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না হয় তাহলে তিনি মালিককে চুরি যাওয়া সম্পত্তির মূল্য অবশ্যই প্রদান করবেন। যদি চোর ধরা পড়ে কিন্তু চুরি যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার করা না যায় তাহলে সম্ভব হলে চোরকে বাধ্য করতে হবে মূল্য ফেরত দেওয়ার জন্য অথবা রাজা নিজে অবশ্যই এই অর্থ প্রদান করবেন। (কাত্যায়ন ৮১৬-৮১৭)"

(৩) অসহায় এবং ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে রক্ষার কর্তব্য ঃ

कृपणानाथवृद्धानां विद्यावानां च योषिताम् ।
योगक्षेमं च वृत्तिं च नित्यमेव प्रकल्पयेत् ॥
आश्रमेषु यथाकालं चैलभाजनभोजनम् ।
सदैवोपरेद्राजा सत्कृत्याभ्यर्च्य मान्य च ॥

"নিঃসহায়, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, উন্মাদ, বিধবা, অনাথ, ব্যাধিগ্রস্থ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এবং গর্ভবতী মহিলা ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে রাজার উচিত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং ঔষধ দিয়ে তাঁদের হিতসাধনের চেষ্টা করা।" (মহাভারত শান্তি পর্ব ৮৬-২৪-২৬)

ঐতিহাসিক নথি পত্র থেকে জানা যায় যে বিভিন্ন রাজা তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে এবং সুরক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে গিয়ে অসংখ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। (লিগ্যাল এ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল হিষ্ট্রি ১ম খন্ড, পৃ ৬৬৬-৬৮১)

রাজতরঙ্গিনীতে একটি উদাহরণমূলক ঘটনার কথা নথিবদ্ধ আছে যে কিভাবে কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রপীর (খৃষ্ট্র পরবর্তী ৬৮০-৬৮৮) আইনের শাসনকে তুলে ধরেছিলেন এবং তাঁর নিজের আধিকারিকগণ পরিকল্পিত কাজের বিরুদ্ধে এক চর্মকারের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন।

রাজার আধিকারিকগণ কোন একটি জায়গায় ভগবান ত্রিভুবন স্বামীর মন্দির নির্মান করার কাজ শুরু করেন। সেই জায়গার একটি অংশে এক চর্মকারের একটি কুঁড়েঘর ছিল। রাজার আধিকারিকরা তাকে বলা সত্ত্বেও সে তার কুঁড়ে ঘরটি সরিয়ে নিতে অস্বীকার করেছিল। তার ফলে রাজার আধিকারিকরা এই বিষয়ে রাজার কাছে নালিশ করেছিল এবং চর্মকারের একগুঁয়েমির ব্যাপারটি রাজার গোচরে এনেছিল। যাইহোক আশ্চর্যের বিষয় যে, চর্মকারের জায়গায় জোর করে দখল করার জন্য আধিকারিকরা রাজার কাছ থেকে ধমকানি খেয়েছিলেন এবং তাঁর অনুমতি না নিয়ে নির্মাণকার্য শুরু করার মত দূরদৃষ্টির অভাবের জন্য রাজা তাঁদেরকে তিরষ্কার করেছিলেন এবং এই আদেশ দিয়েছিলেন যে ঃ

नियम्यतां विनिर्माणं यद्वान्यत्र विधीयताम् ।
परभुम्यपहारेण सुकृतं कः कलंकयेत् ॥
ये द्रष्टारः सदसतां ते धर्मविगुणाः क्रियाः ।
वयमेव विदध्मश्चेत् यातु न्यायेन कोऽध्वना ॥

"নির্মাণকার্য বন্ধ কর অথবা অন্য কোন জায়গায় নির্মাণ (মন্দির) কর। বেআইনীভাবে একজন মানুষকে তাঁর জমি থেকে বঞ্চিত করি এমন এক ধার্মিক কাজকে কে কলুষিত করবে? আমরা যারা ভালমন্দের বিচারক তারা যদি বেআইনি কাজ কর তবে কে আইনকে মান্য করবে?" (রাজতরঙ্গিনী-IV ৫৯-৬০)

পরের দিন চর্মকার অনুরোধক্রমে রাজসভায় রাজার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছিলেন। তিনি রাজাকে বলেছিলেন "মহারাজ! রাজপ্রাসাদ যেমন আপনার, ঠিক তেমনি কুঁড়ে ঘরটিও আমার। আমি আমার চোখের সামনে এই কুঁড়ে ঘর ভেঙ্গে ফেলা সহ্য করতে পারব না। একজন মানুষ যাকে তার বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তার দুঃখ আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন। যাহোক যদি মহারাজ আমার কুটীরে আসেন তাহলে আমি মহৎ

আচরণবিধির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই কুটীর প্রদান করব।"

রাজা অতি নম্রতাসহ চর্মকারের কুটীরে গিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে হিসাব অনুযায়ী মূল্য প্রদান করে কুঁড়েটি ক্রয় করে নিয়েছিলেন। চর্মকার তখন হাত জোড় করে রাজাকে এই কথা বলেছিলেন ঃ

राजधर्मानुरोधेन परवत्ता तवोचिता ।
स्वस्ति तुभ्यं चिरं स्थेया धर्म्या वृत्तन्तपद्धतिः ।
दर्शयन्नीदृशीः श्रद्धः श्रद्धेया धर्मचारिणाम् ॥

"রাজধর্মের নীতি মান্য করে অন্যের (সে যতই ছোট হোক না কেন) প্রতি সম্মান দেখানো রাজার যথোপযুক্ত আচরণ। আমি আপনার মঙ্গল কামনা করি। আইনের (ধর্ম) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে আপনি দীর্ঘজীবি হউন। ধর্মের প্রতি আপনার এই বিশ্বাস দেখে অন্যরাও অনুরূপ আচরণ করবে।" (রাজতরঙ্গিনী-IV ৭৫-৭৭)

সত্য আইনই (ধর্ম) সর্বোচ্চ ছিল। আইনের সাহায্যে এক দুর্বল চর্মকার বলবান রাজার আধিকারিকদের এমন কি রাজার বিরুদ্ধে ও জয়লাভ করেছিলেন।

পূর্বোক্ত ব্যবস্থা থেকে দেখা যায় যে কিভাবে সুরক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল এবং কিভাবে অনুরূপ রাষ্ট্রের কর্তব্য সৃষ্টি করে তাকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। আমাদের সংবিধানে নাগরিকের সুরক্ষার অধিকার বলপ্রয়োগকারীদের দ্বারা লঙ্ঘিত হলে তা রক্ষা করার জন্য শাসনকর্তার এই কর্তব্য আদালতের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ২১ ধারায় বলা হয়েছে,

২১, জীবন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা ঃ

আইনের অনুশাসন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকেই তাঁর জীবন অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

এই মূল মানব অধিকারটিকে রক্ষা করার জন্য ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বহু সংখ্যক মামলায় এই ধারার সম্ভাব্য ব্যাপকতম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

খরক সিং বনাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (এ আই আর ১৯৬৩ এস সি ১২৯৫) এবং মানেকা গান্ধী বনাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মামলার সূত্রে (এ আই আর ১৯৭৮ এস সি ৫৯৭), আদালত বলেছিলেন যে ২১ ধারায় বর্ণিত ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কিত বক্তব্যটির যথেষ্ট ব্যাপ্তি আছে এবং তা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রকার অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। ২১ ধারার অন্তর্ভূক্ত নানাবিধ নিয়মগুলি হল ঃ

(১) বিচারাধীন কারাগারে বন্দীদের মানবিক আচরণ পাবার অধিকার আছে। তাদের অপরাধে দন্ডিত কোন লোকের সাথে না থাকার অধিকার আছে। কারণ, তার অর্থ হবে হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য গিয়ে অন্য ছোঁয়াচে রোগীর সাথে রাখার ফলে কোন ব্যক্তির নতুন অসুখ নিয়ে বাড়ী ফেরা। (সুনীল বাটরা বনাম দিল্লী প্রশাসন, এ আই আর ১৯৮০ এস সি ১৫৭৯)

(২) বিচারাধীন কয়েদীর অধিকার আছে সম্ভাব্য প্রদত্ত শাস্তির মেয়াদের থেকে বেশীদিন শাস্তি ভোগ না করা। (হুসেইনারা খাতুন বনাম বিহার সরকার, এ আই আর ১৯৭৯ এস সি ১৩৬৯)

(৩) দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদির অধিকার আছে যার সাহায্যে সে আবেদন করতে পারে (মাধব হায়াওয়াধানারাও হসকট বনাম মহারাষ্ট্র সরকার; এ আই আর ১৯৭৮ এস সি ১৫৪৮)

(৪) গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার (গোবিন্দ বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকার; এ আই আর ১৯৭৫ এস সি ১৩৭৮)

(৫) অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কয়েদির বিনামূল্যে আইনি সাহায্য পাবার অধিকার (খারত্রী বনাম বিহার সরকার; এ আই আর ১৯৮১, এস সি ৬২৫)

(৬) নিঃসঙ্গ কারাবাস কালীন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার বিরুদ্ধে অধিকার (কিশোর সিং রবীন্দ্র দেব বনাম রাজস্থান সরকার, এ আই আর ১৯৮১ (১), এস সি সি ৬২৭)

(৭) চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার। (মোহিনী জৈন এবং উন্নিকৃষ্ণান)

এর ফলে প্রত্যেক অধিকার যা স্বচ্ছন্দ এবং মর্যাদাসম্পন্ন ও সুখী জীবন উপভোগে প্রয়োজনীয় এবং যা ২১ ধারার স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত ভারতীয় তাকে সংবিধানের ১৪ ধারার সমান অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

যে কোন ধর্ম আচরণ করার এবং সমিতি গঠন করার অধিকার

ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা বা না করার ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। অধিকন্তু, যাঁরা ভগবানে বিশ্বাস করেন তাঁদের ভগবানকে যে কোন রূপে বা নামে বিশ্বাস করার ও নিজ পছন্দ অনুযায়ী যে কোন ধর্ম অনুসরণ এবং আরাধনার যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করার স্বাধীনতা ছিল। যদিও মূলতঃ প্রত্যেকে বিশ্বাস করেন যে ভগবান এক, এই উদার পন্থার জন্য ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং পছন্দ অনুযায়ী এবং তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভগবানের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল— যেমন রক্ষার দেবতা, জ্ঞানের দেবী, শক্তির দেবী, সম্পদের দেবী, বিপদ দূর করা দেবতা, প্রকৃতির দেবতা, জল, বায়ু পৃথিবী, আলো, গাছ ইত্যাদির দেবতা। ফলস্বরূপ, দেবতার সংখ্যা যদিও বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু তা 'ভগবান এক' এই বিশ্বাসের বিঘ্ন ঘটায় নি।

এটাই সম্ভবত সারা বিশ্বের তুলনায় আমাদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিশেষত্বের প্রতীক। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি জনপ্রিয় একটি শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् ।
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥

ঠিক যেমন বৃষ্টির জল আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে একই সমুদ্রে পৌঁছায়, ঠিক তেমনই ভগবানের ভিন্নতা কেবলমাত্র নামে, গন্তব্যস্থল যদিও একই।

অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত একটি প্রার্থনামন্ত্র ধর্মাচরণের আধিকারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ঃ

यं शौवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदांतिनो
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयुयायिकाः ।

একই ভগবানকে শৈবরা শিব বলে, বেদান্তীয়রা ব্রহ্ম বলে, বৌদ্ধরা বুদ্ধ বলে, নৈয়ায়িকরা কর্তা বলে, জৈনরা অরহট বলে, এবং মীমাংসকরা 'কর্ম' ভেবে তাঁদের নিজ নিজ আকাঙ্খা পূরণের জন্য পূজো করে।

স্পষ্টতঃ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ, অন্যান্য ধর্মের এই দেশে আগমনের পূর্বে, যারা এই দেশে বসবাস করত, তাঁদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন নামে ভগবানের আরাধনার বিষয়টি এই পংক্তিগুলিতে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু তা মুসলমানদের আল্লা নামে ভগবানের পূজো এবং খৃষ্টানদের প্রভু বলে পূজো করা এবং অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী মানুষের যে কোন নামে পূজো করাকেও অন্তর্ভূক্ত করে।

ভগবান বিভিন্ন অগণিত নামে পূজিত হলেও এবং বিভিন্ন দেবতার তত্ত্ব থাকলেও, ভগবান এক, এই মূল সত্যই ঘোষিত হয়। সেটি যে এই দেশের সকল মানুষের স্থির বিশ্বাস, সেটা প্রমাণিত। যদি কোন সাধারণ মানুষ বা সাধারণ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "কতজন ভগবান আছেন?" সকলের কাছ থেকে একটি উত্তর পাওয়া যাবে, "ভগবান এক"। মানুষ ভগবানকে অসংখ্য নাম দিয়ে পূজো করে এবং তাতে এই সত্যটিই প্রমাণিত হয় যে এই দেশে প্রকৃত এবং নিরঙ্কুশ ধর্মীয় স্বাধীনতা বর্তমান। এখানে কাউকে কোন বিশেষ ভগবানের পূজা করতে বাধ্য করা হয় না। কোন বিশেষ ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া বা ধর্মীয় একনায়কত্ব এই দেশে নিষিদ্ধ। আমাদের সমাজ সেই ধর্মভিত্তিক সমাজ যা প্রত্যেক

ধর্মকেই শ্রদ্ধা করে। এই নির্দিষ্ট বিধানকে রাজধর্মের অঙ্গীভূত করে মূল মানব অধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। কোনরকম পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই প্রত্যেক ব্যক্তিকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः
सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥

রাজা বেদে বিশ্বাসী (নৈগমা), সকল সমিতি এবং বেদে অবিশ্বাসী সকলকেও (পাষন্ডীদের) এবং অন্য সকলকে রক্ষা করবে। (ধর্মকোষ পৃ ৮৭০)

ধর্মের উপরোক্ত বিধানটি অনন্য। তা রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র বেদে বিশ্বাসীদের জন্য নয়, এমনকি বেদে অবিশ্বাসীদের সমান সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেয়। এটিই চিন্তার এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার বিস্তার, যা ভারতে মূল মৌলিক অধিকার হিসাবে পরিগণিত। অনুরূপভাবে সমাজের একটি অংশের মানুষের যে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে থাকার অথবা যে কোন পেশার, ব্যবসায় পরিচালনা করার অথবা যেকোন সমিতি গঠন করার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

पाषण्डनैगमश्रेणीपुगव्रातगणादिषु ।
संरक्षेत्समयं राजा दुर्गे जनपदे तथा ॥

ইতিহাসে নথিবদ্ধ আছে যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণী ভিত্তিক সমিতির অস্তিত্ব ছিল। (লিগাল এ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল হিষ্ট্রি ৫ম খন্ড ১৭৪-১৭৫) স্মৃতির প্রাথমিক অনুশাসনগুলি থেকে এই সত্য অনুধাবন করা যায় ঃ

नानापौरसमूहस्तु नैगमः परिकीर्तितः ।
नानायुधधरा व्राताः समवेताः प्रकीर्तिताः ॥
समुहो वणिजादीनां पूगः संपरिकीर्तितः ।
प्रव्रज्यावसिता ये तु पाषण्डाः परिकीर्तिताः ॥
ब्राह्मण्नां समूहस्तु गणः संपरिकीर्तिताः ।
शिल्पोपजीविनो ये तु शिल्पिनः परिकीर्तिताः ।

(১) নৈগমা— একই শহরে বসবাসকারী মানুষের নির্দিষ্ট গোষ্ঠী।

(২) ভ্রাতা— বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র ধারণকারী একদল মানুষ।

(৩) পূগা (শ্রেণী) ব্যবসায়ীদের গোষ্ঠী (গিল্ড)।

(৪) পাষন্ডী— বেদের অবিশ্বাসী বিরুদ্ধবাদী একটি গোষ্ঠী।

(৫) গণ— মানুষের গোষ্ঠী যারা কোনো না কোনো কারুশিল্পে নিযুক্ত।

(৬) সংঘ— অরহাটের (জৈনরা) অনুসরণকারীগণ অথবা বুদ্ধের অনুসরণকারীগণ (বৌদ্ধরা), (কাত্যায়ন স্মৃতি (৬৭৮-৬৮১)

এটা পরিস্কার যে কোন শহরে বসবাসকারী মানুষ, কারিগর অন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষ এবং এমনকি প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিগণের সমিতি বা সংঘ প্রাচীন ভারতে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করতে সমর্থ হত। রাজাকে সর্বোচ্চ

প্রাধান্য দিয়ে প্রত্যেকটি সমিতির কথা শুনতে হত এবং শাসনব্যবস্থার বিষয়েও তাঁদের বক্তব্যকে মান্য করতে হত।

समुहकार्य आयातान्कृतकार्यान् विसर्जयेत् ।
स दानमानसत्कारैः पुजयित्वा महीपतिः ॥

"রাজাকে প্রথমে একটি সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐ সমিতির সদস্যদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে হত এবং তারপর তাদের বিদায় নেবার আগে, ভাল কথায় আপ্যায়ন করতে হত এমনকি উপহার সামগ্রী দিয়ে সম্মান জানাতে হত।" (যাজ্ঞবল্ক্য -II- ১৮৯)

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী, একটি সমিতির প্রতিনিধিত্ব করছেন এমন কেউ রাজার দর্শনপ্রার্থী হলে, তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া রাজার কর্তব্যের মধ্যে পড়ত। তাঁকে তাদের নিবেদন অথবা উপস্থাপিত বিষয়গুলিকে ভদ্রভাবে শুনতে হত। অধিকন্তু, প্রস্থানের সময় তাদের উপহার দিয়ে সম্মান জানাতে হত এবং সকল প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে হত। এই বিধি থেকে দেখা যায় যে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী ধর্মীয় গোষ্ঠী অথবা সমিতিগুলির উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল এবং রাজা তাঁদের মতামতকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে পারতেন না।

বিশ্ব-ঘোষণার ১৮ এবং ২০ নং ধারায় উপরোক্ত অধিকারকে মানব অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

(১৮) প্রত্যেকের চিন্তা, বিচারবুদ্ধি এবং ধর্মের স্বাধীনতা আছে। এর সঙ্গে সংযোজিত অধিকারগুলি হল ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা এবং একা অথবা সমষ্টিগতভাবে অন্যদের সঙ্গে এবং গোপনে বা প্রকাশ্যে তার ধর্ম বা বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারা—শিক্ষা, পালন, পূজা বা মান্য করার মাধ্যমে।"

২০ (১) প্রত্যেকের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা সমিতি গঠনের অধিকার আছে।

(২) ব্যক্তিকে কোন সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

রাজধর্মের এই সকল নীতিগুলি সকল হিন্দু রাজাদের দিকনির্দেশ করত এবং সেজন্য এই দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে ধর্ম বা বিশ্বাসের কারণে জনগণের উপর কোন অত্যাচার করা হয়নি। "ধর্ম"-র প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে ভারতবর্ষে কখনো ধর্মীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেনি।

এই কারণবশতঃই আমাদের সংবিধান সকলকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্ম আচরণ করার মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে।

২৫ নং নিবন্ধে বলা হয়েছে,
"২৫, বিবেক অনুযায়ী কাজ করা স্বাধীন পেশা অবলম্বন এবং আচরণ ও প্রচারের স্বাধীনতা" সকলেই ভোগ করবে।

(১) জনগণের শান্তি, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য এবং অংশের অন্যান্য বিধানগুলি বজায় রেখে সমস্ত মানুষ সমানভাবে তাদের বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের, ধর্মাচরণের এবং ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে।

এইভাবে, জনগণ কর্তৃক তৈরী এবং গৃহীত আমাদের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা একটি গর্বের বিষয়।

মহিলাদের বিশেষ অধিকার

সাম্যের অধিকার বা সকল মানব অধিকার নিঃসন্দেহে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। নারীত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে এবং দুষ্ট প্রবণতাগ্রস্ত পুরুষদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নারীদের অসহায়তার কথা ভেবে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌রা মহিলাদের বিশেষ সুরক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এটি সাধারণ জ্ঞান যে নারীর উপর পুরুষের অত্যাচার মানব সমাজের ইতিহাসে একটি চিরাচরিত সমস্যা। বর্তমানে আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ে যখন আমরা গর্ব করি, তখনও নারীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে। পুরুষ নারীর সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার করে, বিশেষ করে মনুষ্যরূপী কিছু দানব নারীর উপর যৌন আক্রমণ এমন কি ধর্ষণের ন্যায় ঘৃন্য অপরাধ করে নারীর জীবন ধ্বংস করে চলেছে। সাধারণ ভাবে বিভিন্ন আইন বলবৎকারী সংস্থা যেমন পুলিশ, আদালত প্রভৃতি, অত্যাচারের ফলে নারীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবার পরেই প্রতিকারের জন্য তৎপর হয়ে থাকে। এই সংস্থাগুলি নারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।

উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌রা নারীর অধিকার রক্ষার বিষয়টিকে নারীর ক্ষেত্রে র সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হন যে প্রাথমিক থেকে সমস্ত স্তরে নীতি শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষতঃ পুরুষদের মধ্যে নারীত্বের আদর্শ বপন করাই নারীর প্রতি শ্রদ্ধার অধিকার রক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ট উপায়। এই ব্যবস্থাকেই নারীর নানা অধিকার রক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করা হয়েছিল।

আদি-অনন্তকাল থেকে এই অধিকারটি আমাদের দেশে সর্ব্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত জীবনের মূল্যবোধ হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। নারীকে কেবলমাত্র শারীরিক আনন্দের বস্তু বলে গণ্য না করে তাঁদেরকে সংসার জীবনের স্বর্গীয় ভান্ডার হিসাবে গণ্য করার জন্য পুরুষদের নির্দেশ দেওয়া হত। প্রকৃতি নারীকে মাতৃত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আবার মা, ব্যক্তির কাছে পৃথিবীর সর্ব্বাধিক আপনজন। সন্তানের প্রতি মায়ের নিবিড় ভালবাসা ও স্নেহ এবং সন্তানের জন্য মায়ের সর্বস্ব ত্যাগের সহজাত প্রবৃত্তির জন্য মা সাক্ষাত দেবতা হিসাবে পরিগণিত। অধিকন্তু প্রত্যেক নারীই যেহেতু মাতৃত্বের এবং মাতৃসুলভ গুণাবলীর অধিকারী সেজন্য মাকে দেবী হিসাবে শ্রদ্ধা করা এবং পত্নী ছাড়া অন্য নারীকে মা হিসাবে গণ্য করার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

নারায়ণের হিতোপদেশ আদর্শ আচরণাবলীর একটি সংকলন। এই গ্রন্থে নারায়ণ তাঁর অননুকরণীয় পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত উপদেশগুলির কথা বলেছেন ঃ

मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् ।
आत्मवत्सर्वभुतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ १४ ॥

"যিনি নিজের পত্নী ছাড়া অন্য নারীদের মায়ের মত মনে করেন, অন্যের সম্পদকে মাটির খন্ডের সমান জ্ঞান করেন এবং অন্য মানুষকে নিজের আপনজন মনে করেন তিনিই যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি (পন্ডিত) বলে বিবেচিত হবার যোগ্য"।

যুবসমাজ যাতে বিপথ গামী না হয় এবং নারীদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার না করে সেই উদ্দেশ্যে উপরোক্ত মূল্যবোধটিকে ধৈর্য্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মন থেকে নারী সম্পর্কিত কুচিন্তা দূর করার জন্যই নারীকে মাতৃতুল্য হিসাবে তুলে ধরার আদর্শ উদ্ভাবন করা হয়েছিল।

ফলস্বরূপ, প্রত্যেক মহিলাকে, এমনটি ছোট মেয়েদেরও, মা, আম্মা ইত্যাদি সম্বোধনে সম্বোধিত করা শুরু হয়। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ব্যক্তির গভীরে প্রোথিত হয়েছিল এবং এই শিক্ষাই নারীর অধিকার রক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলে পরিগণিত হয়েছিল। শত শত শতাব্দী ধরে সম্ভাবতঃ এটিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মৌলিক অধিকার যা কল্পিত ও চর্চিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই প্রতিষ্ঠিত ও পরীক্ষিত অধিকারটিকে অগ্রাহ্য করে কিছু মানুষ নারীকে উপভোগের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য নারীত্বের অবমাননা করে তাকে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করেছে। পরবর্তী প্রজন্ম, এমনকি নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে, এই আচরণের অনিষ্টকর প্রভাবের বিষয়টি, এই সকল মানুষ অনুধাবন করছেন না।

পুরুষের যৌন প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার জন্যই সম্ভবতঃ নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই মূল্যবোধ সৃষ্টি ও চর্চিত হয়েছিল, কারণ প্রত্যেক নারী মায়ের সমান, এই বোধ কোন মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হলে, নারীর প্রতি অত্যাচার করার চিন্তা বিনষ্ট হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই মূল্যবোধের অনুশীলন পুরুষের যৌন প্রবণতার বিরুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। এই মূল্যবোধের সৃষ্টি ও পালন সত্যই মানবতার প্রতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের একটি মূল্যবান অবদান। প্রকৃতপক্ষে সীতা এবং দ্রৌপদীর উপর আক্রমণের ফলস্বরূপ আমাদের দেশে দুটি মহাযুদ্ধ— যথাক্রমে, রাম-রাবণের যুদ্ধ ও কৌরব-পান্ডবের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। যাহোক সাম্প্রতিককালে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের পতন হলেও মানুষের মধ্যে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মূল্যবোধ এখনও বহুল পরিমানে বর্তমান এবং এই মূল্যবোধই মহিলাদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্ব্বাধিক কার্যকরী প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে চলেছে।

নারীত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা ছাড়া পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর আক্রমণের বিষয়টি বিবেচনা করে মহিলাদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য কিছু বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন বয়সে ও জীবনের প্রতি পদে সংসারে মহিলাদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য পুরুষ সদস্যদের নির্দেশ করা হয়েছে। ধর্মের যে বিধানে সংসারের পুরুষ সদস্যদের উপর মহিলাদের সুরক্ষার কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে ॥
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

"বালিকাকে শৈশবে রক্ষা করেন তাঁর পিতা,
বিয়ের পরে রক্ষা করেন স্বামী এবং
বৃদ্ধবয়সে পুত্রসন্তানরা তাঁকে রক্ষা করেন।
কোন অবস্থাতেই একজন নারীকে একা
ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।"

উপরোক্ত শ্লোকটির প্রথমাংশ ও মনুস্মৃতির অন্যান্য শ্লোকগুলি বিবেচনা না করে শুধুমাত্র এই শ্লোকটির শেষাংশের উপর ভিত্তি করে অভিযোগ আনা হয়েছে যে মনুস্মৃতিতে নারীকে, পুরুষের দাসী হিসাবে জীবন অতিবাহিত করার কথা বলা হয়েছে। যদিও আদতে মনুস্মৃতিতে নারীর সম্মান ও সুখ নিশ্চিত করার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। (III-৫৬-৫৭-৫৮-৬২-১১৪)

উপরোক্ত সমালোচনাটি আদৌ সত্য নয়। সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী দেখা যায় যে অসভ্য মাদকাসক্ত ব্যক্তি ছাড়া, বেশীরভাগ পরিবারে সকলেই নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে, এমনকি তাঁরা পরিবারে ভাগ্য নির্ধারণ করেন, পারিবারিক বিষয়ে নারীর মতামতকে আজও প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। অতএব উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ ও উদ্দেশ্য হল যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সুরক্ষা প্রয়োজন ও তা তাঁদের প্রাপ্য। পিতা, স্বামী ও পুত্রের কর্তব্য যথাক্রমে

কন্যা, পত্নী ও মাতার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। পিতার কর্তব্য তাঁর কন্যার যথাযথ প্রতিপালন, মেধা অনুযায়ী কারুশিল্প ও সংগীত সহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তার বিবাহের ব্যবস্থা করা। এব পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে প্রতিপালন করার মৌলিক কর্তব্য ও দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে সন্তান বড় হলে প্রতিপালনের দায়িত্ব পুত্রের উপর ন্যস্ত হয়। বস্তুতঃ শিশু পুত্রসন্তান ও বৃদ্ধ পিতার সুরক্ষা ও যত্ন করা আবশ্যিক।

মহিলাদের জন্য অবশ্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেজন্য শ্লোকটির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, পিতা, স্বামী ও পুত্রের যথাক্রমে কন্যা, পত্নী ও মাতার প্রতিপালনের কর্তব্যকে নির্দেশ করা। এই শ্লোকে নারীদের বশীভুত করা বা তাদের উপর কর্তৃত্ব করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কাজেই, নারীকে তাঁর বাল্যকালে পিতা, বিবাহের পরে স্বামী এবং বৃদ্ধাবয়সে পুত্র দাসী হিসাবে গণ্য করবে বা সারাজীবন নারীকে পরাধীন জীবনযাপন করতে হবে—শ্লোকটির এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং বিকৃত।

মনুর এই বির্তকিত শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ, কেরী ব্রউন নামে একজন ব্রিটিশ লেখক তাঁর "দি এসেন্সিয়েল টিচিংস্ অফ্ হিন্দুইজিম" (এ্যারো বুক্স, লন্ডন ১৯৯০) গ্রন্থে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"হিন্দু ধর্মে একজন নারীকে নিকৃষ্ট বা অক্ষম হিসাবে দেখা হয়না বরং তাকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়। নারী সমাজের গর্ব ও শক্তি। রাজ অলঙ্কার যেমন অরক্ষিত রাখা উচিত নয়, তেমনি মহিলাদেরও অরক্ষিত রাখা উচিত নয়। নারীরা যেহেতু সমাজের অসংখ্য দায়ভার বহন করে যেমন সন্তানের জন্ম দেওয়া ও দেখাশোনা করা, সংসারের কাজ করা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা ইত্যাদি, সেহেতু তাঁদের উপর অর্থ উপার্জনের অতিরিক্ত দায়ভার ন্যস্ত করা উচিত নয়। নারীই তাঁর সন্তানের কাছে সংস্কৃতি পৌঁছে দেয়।"

নারীর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকাটি যথাযথ ভাবে চিহ্নিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু পেশায় যেমন ব্যবসা, রাজনৈতিক শাসন, আমলাতন্ত্র, প্রযুক্তি বিদ্যা, ওকালতি, বিচারপতির দায়িত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা দক্ষতা দেখিয়েছেন।

বহুক্ষেত্রে নারীরা পুরুষকে অতিক্রম করে গেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল যে বর্তমানের বস্তুনির্ভর সামাজিক পরিবেশে, যুব সমাজের অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সন্তানকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ শেখানো এবং সুযোগ্য নাগরিক করে গড়ে তোলার জন্য মা হিসাবে নারীর কর্তব্য তো কমেই নি বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করছি যে নারীর উপর অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চলেছে। সিনেমা, পত্রিকা, ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে অশ্লীলতা অগ্নিশিখার মত ছড়িয়ে পড়ছে। এইসব এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ বিশেষতঃ আমাদের সংস্কৃতিতে স্বীকৃত নারীর মানবিক অধিকারের পরিপন্থী বিভিন্ন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারী সংগঠন নারীর সুরক্ষায় সচেষ্ট। যেহেতু নারীরা বিভিন্নভাবে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে থাকে, সেহেতু ধর্ম ও রাজধর্মের বিভিন্ন বিধানের মাধ্যমে নারীকে এবং তাঁর সম্পত্তিকে সারাজীবন সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিধানগুলির মধ্যে কিছু নিচে দেওয়া হল ঃ

(১) নারীর সম্পত্তির ক্ষেত্রে জবর দখল আইন প্রয়োগের ছাড়

অন্যায়ভাবে দখলীকৃত সম্পত্তির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত আইন খুবই কঠোর যা একমাত্র তিন প্রজন্মের পর প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু মহিলা, রাষ্ট্র এবং মন্দিরের সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়।

न भोगं कल्पयेत्स्त्रीषु देवराजधनेषु च ।

"মহিলা, রাষ্ট্র এবং মন্দিরের কোন সম্পত্তির ক্ষেত্রে অন্যায় দখলদারীর কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।" (কাত্যায়ন-৩৩০)

দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্র এবং মন্দিরের সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে সেই একই রকম সুরক্ষার ব্যবস্থা মহিলাদের সম্পত্তির ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

(২) জরিমানার পরিমানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান ঃ

सर्वेषु चापराधेषु पुंसो योऽर्थ दमः स्मृतः ।
तदर्ध योषितो दद्युयेधे पुंसोंग कर्तनम् ॥

"সকল রকম অপরাধের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট জরিমানার অর্দ্ধেক পরিমাণ, একজন নারীর ক্ষেত্রে ধার্য করা হবে।" (কাত্যায়ন-৪৮৭)

এই বিধানের দু ধরণের প্রভাব ছিল। শুধুমাত্র জরিমানার পরিমাণই কম করা হত না এমনকি, মৃত্যু দন্ড থেকেও মুক্তি দেওয়া হত।

(৩) কয়েদখানায় মহিলাকে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদন্ড।

संरुद्धस्य वा ततैव घातः ।
तदेवाध्यक्षेण गृहीतायामार्यायां । विद्यात् ॥

রাষ্ট্রের আধিকারিক কর্তৃক বন্দী করে আনা মহিলাকে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদন্ডের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। (কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র, ২৫৬ পৃ)

ভারতীয় ফৌজদারী বিধির ৩৭৬ ধারায় এই ধরণের অপরাধের জন্য সরকারী আধিকারিকদের গুরুতর শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল। ক্রিমিন্যাল ল্ এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৮০-র মাধ্যমে এই বিধানটিকে আবার পরিবর্তন করা হয়েছিল। যার দ্বারা শাস্তির পরিমাণ দশ বছর সশ্রম কারাদন্ডে বর্দ্ধিত করা হয়েছিল।

(৪) স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব

विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत् कार्यवान्नरः ।
अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदृष्येत्स्थितिमत्यपि ॥

"স্বামীর ব্যবসার জন্য বিদেশ যাবার প্রয়োজন হলে স্ত্রীর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে তবেই বিদেশ যাত্রা করতে পারবে।" (মনু-IX- ৯৮)

(৫) বলপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া বালিকার সুরক্ষা ঃ

बलाच्चेत्प्रहता कन्या मन्त्रैर्यदि न संस्कृता ।
अन्यस्मै विधिवदेया यथा कन्या तथैव सा ॥

"যদি বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া কোন অবিবাহিত যুবতীকে আইন অনুযায়ী বিবাহ না করা হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী সেই যবুতীর অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যাবে। তিনি কুমারীর ন্যায় সতী বলে বিবেচিত হবেন।" (বশিষ্ট, পৃ ৯২-৭৩ ঃ ধর্মকোষ,পৃ ১০২১)

এই বিধান ইহাই নির্দেশ করে যে আইন নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে কোন বালিকার বিবাহ না দিলে কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি তাঁকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিয়ে করে স্ত্রী হিসাবে নিজের কাছে রাখলেই সেই মেয়েকে আইনসিদ্ধ ভাবে বিবাহ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়না। ''সে কুমারীর মতই পবিত্র'' এই বাক্যটির সাহায্যে সমাজকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোন একটি অপরাধের বলি কোন ভাগ্যহীনা বালিকাকে সমাজের ঘৃনা করা উচিত নয়। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত মানবিক। পুরুষ কতৃক যৌন নিপীড়নের লাঞ্ছনার বলি কোন বালিকাকে সামাজিক মর্যাদা বা বিবাহ থেকে বঞ্চিত করা একটি অত্যন্ত অমানবিক আচরণ। সেজন্য লাঞ্ছিত বালিকাকে কুমারী হিসাবে সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য উপরোক্ত নির্দেশাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(চ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং মহিলার সম্পত্তি রক্ষা

बालदायादिकं रिक्थं तावद्रजाऽनुपालयेत् ।
यावत्स स्यात्समावृत्तो यावच्चातीतशैशवः ।।

''রাজা একজন অপ্রাপ্তবয়স্কের উত্তাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি রক্ষা করবেন যতদিন না সে তার শিক্ষকের গৃহ (গুরুকুল) থেকে ফিরে আসে অথবা যতদিন না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠে।'' (মনু ৮-১৭)

वशापुत्रसु चैवं त्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ।
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवाखातुरासु च ।।

''একই ভাবে, যে সকল নারীকে দেখার কেউ নাই, পুত্রহীনা, স্বামীহীনা কিংবা বিদেশে গিয়েছেন কিংবা যারা রোগগ্রস্ত বা যাদের কোন সংসার নেই এমন সকল নারীর দেখাশোনা ও তাঁদের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব রাজার।''

রাজধর্মের উপরোক্ত বিধানের চিরন্তন প্রয়োজ্যতা প্রমাণিত হয় বিক্রম দেও সিংহ টোমার বনাম বিহার রাজ্য (১৯৮৮ এস সি সি ৭৩৪) মামলায় ভারতের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের মাধ্যমে, যাতে বলা হয়েছে ঃ

''আমাদের সংবিধান নারীদের জন্য তৈরী আইনগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে। সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর মানবিক ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী জীবন যাপন করার অধিকারী। মানবিক মর্যাদার সঙ্গে জীবন ধারণ করার অধিকার প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এই জন্য সামাজিক অনিয়মের শিকার নারী এবং শিশু উভয়েরই পরিচর্যার জন্য রাষ্ট্রকে পরিচর্যাশ্রম স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

সাধারণ মানবিকতা এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই রাষ্ট্রকে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সর্বজনগ্রাহ্য নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক আদর্শের রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে যে মহিলা এবং শিশুদের যত্নের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলিতে যেন মানবিক মর্যাদা রক্ষার ন্যূনতম শর্ত পালিত হয়।

(ছ) সৈনিকদের পত্নীদের জন্য ন্যূনতম ভাতা।

अव्यर्थाः स्त्रियः स्युः ।।

বশিষ্ঠ তাঁর রচনার ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন, রাজার বিশেষ কর্তব্য হল তাঁর প্রজাদের রক্ষা করা। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য রাজা কর্তৃক সৈনিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে,

''সৈনিকদের পত্নীদের মধ্যে যাঁদের জীবন ধারণের অন্য কোন সংস্থান নেই তাঁদেরকে জীবন ধারণের খরচ দেওয়া রাজার অবশ্য কর্তব্য।'' (বশিষ্ঠ, অনুচ্ছেদ IX-২০)

উপরিল্লিখিত ব্যবস্থা নানাবিধ মানবিক অধিকার সম্বন্ধে একটি পরিস্কার ধারণা দেয়। এই অধিকারগুলি রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। রাজার খাজনা আদায় করার অধিকারের সঙ্গে জনগণের রক্ষা করার কর্তব্যটি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রর্বাট লিনগাট তাঁর "ক্লাশিকাল ল্" নামক পুস্তকে নিম্নলিতখত মন্তব্য করেছেন ঃ

"অসংখ্য গ্রন্থ (বৌধ ১.১০.১; এম,VII, ১৪৪ এবং VIII, ৩০৭, ৩০৮; যজ, ১,৩৩৭; XVIII, ৪৮) রাজার সুরক্ষা প্রদানের কর্তব্যের সাথে তাঁর প্রজাদের খাজনা প্রদানের বিষয়টির একটি সুনিদিষ্ট যোগসূত্র নির্ণয় করেছে"।

"অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের উপর আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ১০.২ অনুচ্ছেদে মাতৃত্বের অধিকারী মহিলাদের বিশেষ সুরক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

"শিশুর জন্মের পূর্বে এবং পরে প্রয়োজনীয় সময়কালের জন্য মাতাকে বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। এই সময়কালে কর্মরত মায়েদের ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে এবং যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা প্রদান করতে হবে"

ভারতীয় সংবিধানের ১৫ (৩) নং অনুচ্ছেদে পরিস্কার ভাবে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার। এই অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, মহিলাকে পুরুষের সঙ্গে সমান সুবিধা প্রদান করা যথেষ্ট নয়।

সমাজে মহিলাদের অসম অবস্থানের ফলে, পুরুষের সঙ্গে সমান সুবিধা প্রদান, বাস্তবে নারীদের ক্ষমতার অধিকারকে অস্বীকার করা হবে।

আমাদের সংস্কৃতিতে বিকশিত নারীদের বিশেষ অধিকার আমাদের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া বনাম নার্গিস মির্জা মামলায় (এ আই আর ১৯৮১ এস সি ১৮২৯) কোন বিমান সেবিকা অন্তঃস্বত্তা হলেই তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হবে, এই আইনটিকে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় খারিজ করে বলেন ঃ

"যে বিধান অনুযায়ী একজন বিমান সেবিকা প্রথম অন্তঃস্বত্তা হলেই তাঁর চাকরীচ্ছেদ ঘটবে, সেই বিধানটি প্রসঙ্গে আমরা শ্রী শীতলভাত এর যুক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে এই আইন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারী। মনে করি যে এই কারণে একজন বিমান সেবিকার চাকরীচ্ছেদ করা শুধুমাত্র একটি সহানুভূতিহীন এবং নির্মম কাজই নয়, তা ভারতীয় নারীত্বের চরম অবমাননা। আমরা লক্ষ্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে এই ধরণের কাজ সভ্যজাতির ক্ষেত্রে একটি অতীব কুরুচিপূর্ণ এবং ঘৃণ্য কাজ।

সম্পূর্ণ রূপে অনৈতিক এই বিধান সমস্ত মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে এবং নির্লজ্জ স্বার্থপরতার সৃষ্টি করে"। নারীর প্রতি ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের প্রবণতা রোধ করার জন্য, মহিলাদের বিশেষ মানব অধিকার রক্ষা করা আবশ্যিক।

সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার

সমস্ত ব্যক্তি সুখী জীবন যাপন করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বা সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হয় না। অনেক ব্যক্তি অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, আর্থিক অক্ষমতা, শারীরিক বিকৃতি, অসুখ, বার্ধক্য, সংসারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু জনিত সমস্যা ইত্যাদিতে ভোগে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যক্তিদের বুনিয়াদী সুখ ভোগের মানব অধিকার আছে এমন কি দুঃখের সময়ও। এই অধিকার রক্ষা করতে হবে অন্য যাঁদের উপর এই সকল মানুষ নির্ভর করে তাদের ও রাষ্ট্রের কর্তব্য সৃষ্টির মাধ্যমে। মহাভারতের একটি শ্লোকে, যা ধর্মের বিধান ঘোষণা করেছে, ব্যক্তির তার উপর নির্ভরশীলদের প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে।

अक्राधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा ।

प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च ॥

आर्जवं भृत्यभुरणं नवैते सार्ववर्णिकाः ॥

"সত্যবাদিতা, ক্রোধমুক্ত থাকা, অন্যের সাথে সম্পদ ভাগ করে নেওয়া, (সম্‌ভিভাগ্‌), ক্ষমা করার মনোভাব, একমাত্র নিজ স্ত্রীর সাহায্যে সন্তান প্রজনন, (যৌন নৈতিকতা), পবিত্রতা, শত্রুতার অনুপস্থিতি, সহজতা, নিজের উপর নির্ভরশীল মানুষদের প্রতিপালন— এইগুলিই হল সকল বর্ণের মানুষের কাছে ধর্মের নয়টি বিধান।" (মহাভারত, শান্তি পর্ব, ৬০-৭-৮)

লক্ষ্যণীয় যে অন্যের সঙ্গে সম্পদ ভাগ করে নেওয়া (সমবিভাগ) এমনকি নিজের উপর নির্ভরশীল মানুষদের প্রতিপালনও (ভৃত্যভরণম্‌) ধর্মের বিধান রূপে ঘোষিত হয়। রাষ্ট্রের উপর কোন বোঝা আরোপ না করে এটিই বোধ হয় আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অন্তর্গত সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক নিরাপত্তা। এই কর্তব্য দুটি নিঃস্বার্থতা এবং ত্যাগ-জীবনের এই দুটি মুখ্য মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত। স্বামী বিবেকানন্দ এগুলিকে আমাদের ভারতীয় মূল্যবোধ বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর ভাষায় ঃ

"ত্যাগ এবং সেবা ভারতের জাতীয় আদর্শ। তাঁকে ঐ সকল আদর্শের দিকে পরিচালিত কর এবং বাকীরাও তাঁর প্রতি যত্নবান হবে (ভারত এবং তার সমস্যা পৃ ১০)

এটি গর্বের ব্যাপার যে আমাদের সভ্যতায় কর্তব্য অথবা পবিত্র দায়বদ্ধতা উদাহরণযোগ্য ভাবে হয়ে থাকে। উপার্জনশীল ব্যক্তি কখনই শুধুমাত্র তার নিজের সম্বন্ধে অথবা পত্নীর ও সন্তানসন্ততিদের জন্য ভাবত না। বৃদ্ধ পিতামাতার, বেকার ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই বোন, বিধবা বোন, অথবা সংসারের অন্য যে কোন সদস্য অথবা সেইসব সদস্য যারা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এদের সবার প্রতিপালন করাকে সে সর্বদা তার পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করত। সে তাদেরকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, শিক্ষা প্রদান করত, বিয়ের ব্যবস্থা করত। সে কখনই তাকে বোঝা বলে মনে করতো না। এই সার্বিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল বর্তমান আধুনিক সভ্যতার পরিকাঠামোর প্রভাবে প্রভাবিত ব্যক্তির স্বার্থপরতার জন্য। ফলস্বরূপ, বার্ধক্য ভাতা প্রদানের সাহায্যে আয় করতে অক্ষম এমন পিতামাতার ভরণপোষণ, বেকার ভাতা প্রদানের মাধ্যমে বেকার ভাইবোনের, পিতা মাতার বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণে অনাথ শিশুদের এবং যে

শিশুদের অন্য কোন ঠিকানা জানা নেই এরকম সকলের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর এসে পড়ল। বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা এই যে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য জরুরী অর্থনৈতিক ব্যয়ভার সাধ্যের সীমা অতিক্রম করছে। এছাড়া 'ছুঁড়ে ফেলার মনোবৃত্তি'-র কারণে মানুষ ধর্মকে পরিত্যাগ করে। ধর্ম বুদ্ধি থেকে উদ্ভুত কৃতজ্ঞতা বোধ অথবা বেকার ভাই-বোনের প্রতি কর্তব্যবোধ পরিত্যক্ত হয়। তা সংসার পরিচালনায় মানবিক মূল্যবোধের অবলুপ্তির ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নয়।

অধিকন্তু, এই ধরণের সম্পূর্ণ স্বার্থপর ও ছুঁড়ে ফেলার মনোবৃত্তির ফলে ক্রমবর্ধমান বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং অনাথ শিশুর জন্ম হচ্ছে এবং ক্রমে নীতিভ্রষ্টা বিপথগামী ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক সমস্যার কারণে মানব সমাজে একটি ভীতিজনক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এইসকল অসংখ্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য এখন মনে করা হচ্ছে যে গৃহস্থাশ্রম ধর্মে উপর নির্ভরশীল তাই ভারতীয় পরিবার কাঠামো যেখানে উপার্জনশীল ব্যক্তির কর্তব্য অন্যান্য উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতিপালন বা দেখভাল করাই সামাজিক নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের একমাত্র উপায়। এই মূল্যবোধ ভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা যা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিবিড় করে এবং যা শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তাদের চরিত্র গঠন করে এবং পরিবারের উপার্জনে অক্ষম সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে তা অপরিহার্য্য বলে বিবেচিত হয় এবং তা রাষ্ট্রের কোষাগারের উপর আর্থিক ভার প্রভূত ভাবে নিরসন করে। অধিকন্তু পরিবার একটি জাতির ভিত্তি ও শক্তি গঠন করে। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জও তা অনুধাবন করেছে ঃ

"পরিবার হল সমাজের স্বাভাবিক মৌলিক একক এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়ার অধিকারী"

১০ (১) ধারায় অর্থনৈতিক, সামজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বলা হয়েছে ঃ

"১০ (১) পরিবারকে সম্ভাব্য সর্বাধিক সুরক্ষা এবং সাহায্য প্রদান করতে হবে যা বিশেষতঃ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক এবং মৌলিক একক, অপর পক্ষে নির্ভরশীল শিশুদের দেখাশোনা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পরিবারের উপর ন্যস্ত।

নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতিপালন করার কর্তব্য পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং যাদের প্রতিপালন করার কেউ নেই এমন অসহায় নাগরিকদের প্রতিপালন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

"রাজা, অসহায়, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, মানসিক ভারসাম্যহীন, বিধবা, অনাথ, রোগগ্রস্ত এবং প্রাকৃতিকদুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, গর্ভবতী মহিলা প্রভৃতি সকলকে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য, বাসস্থান, পরিধান এবং ঔষধ দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করবেন। (মহাভারত, শান্তিপর্ব ৮৬-২৪-২৬)

মানব অধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার ২২ নং ধারায় অনুরূপ ব্যবস্থা হল ঃ

"সমাজের সদস্য হিসাবে প্রত্যেকের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করার অধিকারী।"

এইভাবে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে অনুমোদিত এবং তা সর্বকালের সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কর্মচারীদের ন্যায্য ও মানবিক আচরণ পাবার অধিকার

স্মৃতিসমূহে উল্লেখিত নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী নিয়োগকর্তারা তাঁদের কর্মচারীদের প্রতি ন্যায্য এবং মানবিক আচরণ করবেন। কর্মচারীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করবেন। এই দুটিই কর্মচারীদের মৌলিক মানবাধিকার। রাজধর্ম এবং ব্যবহার ধর্মের (সাংবিধানিক এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন) সংকলন গ্রন্থ শুক্রনীতি এক অগ্রসর পর্যায়কে ইঙ্গিত করে। প্রত্যেক কর্মচারীর মর্যাদা ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য তৈরী এই আইনের কিছু নীচে দেওয়া হল ঃ

(ক) ন্যায্য মজুরী প্রদান ও সভ্য আচরণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

ये भृत्या हीनभृतिकाः शत्रवस्ते स्वयं कृताः ।

परस्य साधकास्ते तु छिद्रकोशप्रजाहराः ॥

"কর্মচারীদের অতি অল্প মজুরী প্রদানের ফলে তারা রাজার শত্রুতে পরিণত হয় এবং তাঁরা ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন এবং সাধারণ জনগণের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হতে পারে। (শুক্রনীতি-II-৮০৭-৮০৮)

वाक्पारुष्यान्युनभृत्या स्वामी प्रबलदण्डतः ।

भृत्यं प्रशिक्षयेन्त्रित्यिं शत्रुत्वं त्वपमानतः ॥

भृतिदानेन सन्तुष्टा मानेन् परिवर्धिताः ।

सान्त्विता मृदुवाचा ये न त्यजन्त्यधिपं हि ते ॥

"(১) অল্প মজুরী, কঠোর আচরণ, অপমান, গালাগাল, অত্যাধিক অর্থদন্ড এবং নির্মম শাস্তি ইত্যাদিই কর্মচারী অসন্তোষের কারণ।

(২) পর্যাপ্ত মজুরী, সম্মানের সঙ্গে পদন্নোতি, মিষ্ট ভাষণ এবং দুঃখে সান্তনা প্রদানকারী প্রভুকে তাঁর কর্মচারীরা কোনদিন পরিত্যাগ করে না। (শুক্রনীতি-II-৮৩৬-৮৩৯)

(খ) ন্যায্য মজুরী ও লভ্যাংশ পাবার অধিকার ঃ

अवश्यपोष्यवर्गस्य भरणं भृतकाद्भवेत् ।

तथा भृतिस्तु संयोज्या तद्योग्या भृतकाय वै ॥

"প্রদত্ত মজুরীর সাহায্যে যদি জীবনধারণের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় তবে সেই মজুরীই ন্যায্য মজুরী বলে বিবেচিত হবে। কর্মচারীর মজুরী অবশ্যই ন্যায্য মজুরী হতে হবে যাতে সে তার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সংগ্রহ করতে পারে। (শুক্রনীতি-II-৮০৫-৮০৬)

अष्टमांशं पारितोष्यं दद्याद्भृत्याय वत्सरे ।

कार्याष्टमांशं वा दद्यात् कार्य द्रागधिकं कृतम् ॥

এই বিধান অনুযায়ী উচ্চ মজুরী প্রদানের বিষয়টি উভয়পক্ষের চুক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অল্প মজুরী প্রদানকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে প্রত্যক্ষ নিয়োগকর্তাকে ন্যায্য মজুরী এবং বাৎসরিক লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে।

"কোন কর্মচারী দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কাজ সম্পাদন করলে তাঁর দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে তার মজুরীর এক অষ্টমাংশ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে হবে" (শুক্রনীতি-II-৮৩০-৮৩১)

(গ) মৃত কর্মচারীর পুত্রকে নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার।

स्वामिकार्ये विनष्टोयस्तत्पुत्रे सद्भृतिं वहेत् ।
याभटूलोऽन्यथा पुत्रगुणान् दृष्ट्वा; भृतिं वहेत् ॥

"যদি কোন কর্মচারী অবসর গ্রহণের পূর্বেই মারা যায় তাহলে তার পুত্র পিতার কাজটি পাওয়ার অধিকারী। যোগ্যতা অনুযায়ী তার মজুরী নির্ধারিত হবে।" (শুক্রনীতি-II-৮৩২-৮৩৩)

উপরোক্ত বিধানগুলি কর্মচারীদের মানবিক অধিকার ঘোষণা ও রক্ষা ছাড়াও মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক নিশ্চিত করে যা প্রশাসন, শিল্প অথবা ব্যবসার সাফল্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে মহাভারতের শান্তিপর্বে 'সমবিভাগকে' ধর্মের একটি বিধান হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। এর অর্থ, প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর সম্পদ অন্যের সাথে ভাগ করে ভোগ করবে। এই বিধান নিয়োগকর্তাদের ক্ষেত্রে আরও বেশীভাবে প্রযোজ্য যেহেতু নিয়োগকর্তারা শ্রমিক কর্মচারীদের শ্রমের সাহায্যে মুনাফা বা সম্পদ অর্জন করে সেহেতু এই সম্পদের বেশীর ভাগ নিজে ভোগ না করে তারা কর্মচারীদেরও ন্যায্য ভাগ প্রদান করবে।

ন্যায্য মজুরী প্রদান করা ছাড়াও মালিকের কর্তব্য হল কর্মচারীদের সঙ্গে সুব্যবহার করা, তাদের দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া এবং মালিক কর্মচারীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য এই সুসম্পর্ক অতি প্রয়োজনীয়। অন্য একটি মানবিক বিধান ছিল যে কর্মচারীদের উপর ধার্য্য শাস্তি কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে না।

অপস্তম্ভ স্মৃতিতে (ধর্মকোষ, পৃ ৮১৬) পরিবারের কর্তার তাঁর গৃহভৃত্যের প্রতি কর্তব্যের বিধান আছে, যা উদাহরণ মূলক।

ये नित्या भाक्तिकास्तेषामनुपरोधेन संविभागो विहितः ।
काममात्मानं भार्या पुत्रं वोपरुन्ध्यान्न त्वेव दासकर्मकरम् ॥

"অতিথিদের খাদ্য পরিবেশন করতে গিয়ে যদি কখনও কম পড়ে তবে গৃহকর্তা তার নিজের, স্ত্রী এবং সন্তানের ভাগ কমাতে পারে কিন্তু কোন মতেই গৃহভৃত্যের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যাগ্রাস করতে পারবে না।" (অপস্তম্ভা-পৃ-১২১-১২২, ১০-১১ ধর্মকোষ পৃ ৮১৬)

এই বিধানের যৌক্তিকতা স্পষ্ট। গৃহকর্তা বা তার পত্নীর খাদ্যের অভাব হলে তারা পুনরায় তা তৈরী করে নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারে। কিন্তু গৃহভৃত্যকে কখনই ক্ষুধায় ভুগতে বাধ্য করা উচিত নয়। সেজন্য খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে গৃহভৃত্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। 'সমবিভাগ' শব্দটির মাধ্যমে বলা হয়েছে যে প্রভু তাঁর ভৃত্যের সাথে খাবার ভাগ করে খাবে। গৃহকর্তার উপর অর্পিত এই কর্তব্য কর্মচারীদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ও জীবন ধারণের মানবিক অধিকারের স্বীকৃতি।

এই মূল্যবান অধিকারটি মানবাধিকারের ২৩ (৩) ধারার অনুরূপ

"২৩ (৩) যে ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত তার ন্যায্য মজুরী পাবার অধিকার আছে যা তার এবং তার পরিবারের মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনে তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

এই ধারাটিকে যদি শুক্রনীতির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে দুয়েরই সারবস্তু এক।

হাজতে ও কারাগারে মানবিক আচরণ লাভের অধিকার

অপরাধ করার অভিযোগে সরকারী আধিকারিক কর্তৃক ধৃত ব্যক্তি বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মানব অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচিত হয়েছিল। এই বিষয়ের উপর নির্দেশিত কিছু ব্যবস্থার কথা নীচে দেওয়া হল যা এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করতে সাহায্য করবে।

(ক) কারাগার ও হাজতখানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ।

(১) বন্দীদের প্রাত্যহিক জীবনে বাধার সৃষ্টি করা—

धर्मस्थीयाश्यारकान्निसारयतो बन्धगाराच्छय्यासनभेजनोश्चार

संचारं ।

रोधबन्धनेषु, त्रिपणोत्तरादण्डाः कर्तुः कारयितुश्र, बन्धनागारात्सर्वस्व

वधश्चं ॥

"কারাগারে বন্দীদের প্রাত্যহিক জীবনে যথা ঘুমানো, খাওয়া, বিশ্রাম ইত্যাদি ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করার জন্য একজন আধিকারিকের তিন পণ বা তার বেশী অর্থদন্ড হতে পারে" (কৌটিল্য পৃ-২২৫-২৩৫-এস)।

(খ) কারাধ্যক্ষ্যের দুর্ব্যবহার।

बन्धनागाराध्यक्षस्य संरुद्धकमनाख्याय चारयतः चतुर्विशति

पणो दण्डः, कर्मकारयतो दिूगुणः ।

स्थानान्यत्वं गमयतोऽन्नपानं वा रुन्धतष्षण्णवतिर्दण्डः ।

परिक्लेशयत उत्कोचयतो वा मध्यमस्साहसदण्डः ।

घ्नतस्साहस्त्रः ॥ चोरडामरिकमार्या मध्यमः ।

संरुद्धिकामार्यामुत्तमः ॥

"কারাগারে কারাধক্ষ্য তাঁর ভুলত্রুটিপূর্ণ অন্যায় কাজের জন্য নিম্নে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য ঃ—

(১) (ক) কারাদন্ডের কারণ না জানিয়ে কোন ব্যক্তিকে কারাগারে রাখার জন্য ২৪ পণ অর্থদন্ড।

(খ) বন্দীদের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার করার জন্য ৪৮ পণ অর্থদন্ড,

(২) বন্দীকে অন্য কোন জায়গায় স্থানান্তরিত করা অথবা খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করার জন্য ৯৬ পণ অর্থদন্ড। বন্দীদের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার করার জন্য ৪৮ পণ অর্থদন্ড।

(৩) বন্দীদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের কাছ থেকে উৎকোচ নেওয়ার জন্য মাঝারি ধরণের অর্থদন্ড।

(৪) কোন বন্দীকে পিটিয়ে মৃত্যু ঘটানোর জন্য, এক হাজার পণ অর্থদন্ড,

(৫) কোন মৃত চোর বা মৃত বন্দীর পত্নীর সঙ্গে যৌন সহবাসের জন্য মাঝারি ধরণের অর্থদন্ড এবং

(৬) হাজতে কোন আর্য নারীর সঙ্গে যৌন সহবাসের জন্য সর্বোচ্চ অর্থদন্ড। (কৌটিল্য-পৃ-২৫৫-২৩৫ এস)

হাজতে এবং কারাগারে বন্দী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও মানব অধিকার রক্ষার জন্য কিভাবে সতর্কতা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা উপরোক্ত বিধানগুলি থেকে ধারণা করা যায়।

(গ) হাজতে ধর্ষণের অপরাধ।

संरुद्धस्य वा तत्रैव धातः ।

तदेवाध्यक्षेण गृहीतायामार्यायां । विद्यात् ॥

'বন্দী করে আনা কোন মহিলাকে
ধর্ষণের অপরাধে সরকারী আধিকারিককে
মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হবে।''

উপরোক্ত বিধানগুলি থেকে ধারণা করা যায় যে জনগণকে রক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত কোন সরকারী আধিকারিক রক্ষার পরিবর্তে জনগণের বিরুদ্ধে কোন দোষ বা অপরাধ করলে তা সঙ্গত কারণেই যথেষ্ট গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হত। কোন সরকারী আধিকারিক আইনসম্মতভাবে হাজতে ধরে আনা কোন মহিলাকে ধর্ষণ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হত।

উপরোক্ত প্রতিরোধমূলক শাস্তিদানের ব্যবস্থাগুলি বর্তমানকালের পুলিশ হেফাজতে সংঘটিত ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য করা হয়। এই ধরণের অপরাধ মোকাবিলা করার জন্য সাংসদরা উপরিউক্ত প্রতিরোধমূলক বিধানগুলি সংযুক্তির দাবি করেন। ফলস্বরূপ, ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬ নং ধারার পরিবর্তন করা হয়েছিল।

(ঘ) যে কোন ব্যক্তি যদি

(১) একজন পুলিশ আধিকারিক হয়ে তাঁর অধীনস্থ এলাকায় অথবা কোন থানায় যদি কাউকে ধর্ষণ করে, অথবা—

(২) যদি একজন সরকারী কর্মচারী হয়ে সরকারী পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে নিজের বা তাঁর অধীনস্থ কোন কর্মচারীর অধীনে বন্দী থাকা কোন মহিলাকে ধর্ষণ করে, অথবা—

(৩) আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত যে কোন কারাগার, হাজত, মহিলা বা শিশুদের উদ্ধার আশ্রমের অধিকর্তা বা তত্ত্বাবধায়ক হয়ে তাঁর সরকারী পদমর্যাদার সুযোগে যদি ঐ প্রতিষ্ঠানের কোন আবাসিকাকে ধর্ষণ করে; অথবা

(৪) হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত কোন আধিকারিক বা কর্মচারী সেই হাসপাতালের চিকিৎসাধীন কোন মহিলাকে ধর্ষণ করলে; অথবা

(৫) গর্ভবতী মহিলাকে ধর্ষণ করলে, অথবা

(৬) গণধর্ষণ করলে

কমপক্ষে দশবছর থেকে আজীবন কারাদন্ড সহ অর্থদন্ডে দন্ডিত হতে পারে।

যথোপযুক্ত এবং বিশেষ কারণ উল্লেখ সাপেক্ষে আদালত উপরোক্ত দুটি সাজার অনধিক দশ বৎসরের মেয়াদের জন্য যে কোন একটি বলবৎ করতে পারেন।''

সরকারী কয়েদখানায় মহিলাদের সুরক্ষার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিকগণ মহিলাদের উপর ধর্ষণজনিত কোন অপরাধ করে থাকলে তাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধানগুলির পরিবর্তে দশ বছরের অধিক স্বশ্রম কারাদন্ডের বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিধান সংশ্লিষ্ট প্রাচীন আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পুলিশ হাজতে এবং কারাগারে বন্দী মানুষের মানবাধিকারের ক্ষেত্রে 'ধর্মে' বর্ণিত আইনগুলির চিরন্তন উপযোগিতা আমাদের সংবিধানের ২১ নং ধারায় বর্ণিত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে স্বীকৃত। উদাহরণ স্বরূপ সুনীল বাটরা বনাম দিল্লী প্রশাসন (এ আই আর ১৯৮০ এস সি ১৫৭৯) মামলার উল্লেখ করা যেতে পারে, এই মামলার রায়ে বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ার সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের পক্ষে বলেছেন যে বিচারাধীন বন্দীদের দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীদের সঙ্গে রাখা একটি মানব অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। আদেশ নামার প্রাসঙ্গিক অংশটি হল ঃ

''বিষয়টির সারমর্ম হল যে আমাদের এই মৌলিক অধিকার সচেতনতার যুগে 'বন্দী প্রদর্শন আবেদনের' (Hebeas corpus writ petition) বহুমুখী কার্যকারিতা আছে এবং মানবিক শালীনতা এবং মর্যাদার সাংবিধানিক স্বীকৃতি এই আবেদনের ক্ষমতার পরীক্ষা স্বরূপ (চতুর্থ অংশ)। আইনের ভিত্তিতে কারাগার প্রতিষ্ঠিত আইনের চোখে বন্দিরা 'জন্তু নয় মানুষ' এই ধারণার বলবৎ করা এবং মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে কলুষিত করার জন্য কারাগারের অভিভাবকদের যথোপোযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা আদালতের কর্তব্য। কারাগারগুলি ভারত ভূমির অংশ বিশেষ। যখন কোন দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে কোন আবেদন করে তখন মনে রাখা দরকার যে স্বল্প ক্ষমতাধারী কারা আধিকারিকগণ ভারতীয় সংবিধানকে অচল করে দিতে পারেনা। যখন কোন বন্দীকে মানসিক ভাবে আঘাত করা হয় তখন সংবিধান শিহরিত হয় এবং যখন আদালত এই ধরণের হিংসা এবং আইন লঙ্ঘনের ঘটনা বিবেচনা করে তখন তা স্বর্গের নেকড়ের দলের মতই দ্রুত গতিতে শিকারের পিছনে ছুটে এবং অব্যাহত গতি ও রাজকীয় তৎপরতায় আদালত সরকারী পদে থাকা অপরাধীদের পিছু নেয় এবং বেআইনি দুঃসাহসিকতাকে ভর্ৎসনা করে। (পার্ট-৫)

এই পীড়া আরও গুরুতর আকার ধারণ করে যখন দেখা যায় যে অনেক বিচারাধীন বন্দীকে আদালতে বিভিন্ন মামলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং তারা সম্ভবত নির্দোষ, যতক্ষণ পর্যন্ত না দোষী প্রমাণিত হচ্ছে। এই সমস্ত বন্দীদের তিহার জেলে পাঠানো হচ্ছে এবং সেখানে সংসর্গদোষ তাদের দাগী অপরাধী হিসাবে তৈরী করা হচ্ছে। এইরূপ কারাগার সংক্রান্ত বিকৃতি সংবিধানের ২১ নং ধারার অন্তর্ভুক্ত ন্যায় বিচারের ধারণার পরিপন্থী। এই ঘটনা হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য যাওয়া কোন মানুষকে সংক্রামক রোগীদের সঙ্গে রেখে তাকে নতুন আক্রান্ত করিয়ে বাড়ী ফেরত পাঠানোর মতই ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা। আমরা এই সাবধান বাণী উচ্চারন করি যে কারাগার সংস্কার এখন সংবিধানগত ভাবে বাধ্যতামূলক এবং তাকে উপেক্ষা করলে আদালত কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে।'' (অনুচ্ছেদ -১৫)

ডি কে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের [১৯৯৭ (১) এস সি সি ৪১৬] মামলায় সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় বলেছেন যে কোন সরকারী আধিকারিক তাঁর অধীনে বন্দী থাকাকালীন কোন ব্যক্তির মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করতে পারবে না। এই বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বক্তব্য হল ঃ—

''সমস্ত কয়েদবাস সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শারীরিক যন্ত্রণা প্রয়োগ করা ছাড়াও একজন ব্যক্তিকে হাজতে বা থানায় যে মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করতে হয় তা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। পুলিশের জিম্মায় থাকাকালীন বন্দীরা শারীরিক নির্যাতন বা ধর্ষণ জনিত যন্ত্রণা ছাড়াও যে পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে তা আইনের আওতার বাইরে থেকে যায় (অনুচ্ছেদ -১২)। ''কয়েদ বাস সংক্রান্ত উৎপীড়ন' এবং পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার শুধুমাত্র এই দেশের ব্যাপারই নয়, বস্তুত তা সর্বব্যাপী। বিশ্ববাসীর এটা একটা উদ্বেগের কারণ যেহেতু এই সমস্যা সারা পৃথিবীর সমস্যা। ১৯৪৮ সালের মানব অধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী কিছু মৌলিক মানব অধিকারের সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা সৃষ্টির প্রবনতা দেখা দিয়েছিল। এই ঘোষণার পঞ্চম ধারায় স্থির করা হয়েছিল যে কোন ব্যক্তির উপর অত্যাচার, অমানবিক ও অপমানকর আচরণ এবং নৃশংস শাস্তি দেওয়া যাবে না। এই সাধু ঘোষণা সত্ত্বেও এবং প্রতিটি সভ্য রাষ্ট্রে এই অপরাধ দূর করার আগ্রহ ও ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও এই ধরণের অপরাধ বেড়ে চলেছে।'' (অনুচ্ছেদ -১৩)।

''মৌলিক অধিকার ভারতীয় সংবিধানের একটি গর্বের বিষয়। ২১ নং ধারা অনুযায়ী আইন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।'' সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতা একটি পবিত্র ও লালিত অধিকার। জীবন বা ব্যক্তিস্বাধীনতা ''কথাটির মধ্যেই মানবিক মর্যাদা সহ বাঁচার অধিকারটি অন্তর্ভূক্ত। এইভাবে এই অধিকারের মধ্যেই নিহিত আছে রাষ্ট্র বা তার কর্মকর্তাদের আঘাত ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তার অধিকারও।'' (অনুচ্ছেদ -১৭)

পূর্বে বর্ণিত রাজ ধর্মের বিধানগুলি থেকে ধারণা করা যায় যে প্রাচীনকালে বিবর্ধিত মানবিক অধিকারগুলির পরিধি ছিল খুবই ব্যাপক। সরকারী আধিকারিকদের অত্যাচার, উৎপীড়ন অথবা অন্য যে কোন প্রকার শারিরীক ও মানসিক আঘাতের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা অধিকার উপরোক্ত মানব অধিকারের মধ্যে নিহিত ছিল। উপরোক্ত অপরাধে অপরাধী আধিকারিকরা তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি পেত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে অতীতে বা সংবিধান চালু হওয়ার পরেও আইন বলবৎ করার জন্য নিযুক্ত পুলিশ ধারাবাহিকভাবে আইনে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি লঙ্ঘন করেছে। পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করার নির্দিষ্ট বিধান সংবিধানে থাকলেও এবং তা ফৌজদারী দন্ডবিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সেই বিধান অমান্য করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই বেআইনীভাবে বহুদিন ধরে আটকের বিরুদ্ধে একমাত্র বন্দি প্রদর্শন আবেদন করলে ঐ ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করা হয়। এ ক্ষেত্রে বলা হয় যে ঐ ব্যক্তিকে আগের দিন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সংক্ষেপে এটা সত্যি যে ভারতীয় সংবিধান মানুষকে অধিকার প্রদান করেছেন কিন্তু সরকারী বিভাগগুলি যদি নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন না করে বা এই সমস্ত অধিকার ভোগ করার ব্যবস্থা না করে তবে এই সকল অধিকারই কাগুজে অধিকারে পর্যবসিত হবে, যখন সরকারী বিভাগগুলি তাদের কর্তব্য সম্পাদনে বিরত হয় বা তারা ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করে বা তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে তখন আদালতের কর্তব্য নির্ভয়ে এই অধিকার বলবৎ এর ব্যবস্থা করা।

সন্তোষের বিষয় এই যে ভারতীয় আদালতগুলি মানবিক অধিকার সুরক্ষা বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলছে। আইনি প্রতিবেদনে এই ধরণের অনেক রায়ের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অভিমত অনুযায়ী মানব অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি জনস্বার্থ মামলার অন্তর্গত। ফলে কোন ব্যক্তির মানব অধিকার লঙ্ঘিত হলে এবং কোন কারণে আদালতে আবেদন করতে অক্ষম হলে যে কোন জনদরদী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির পক্ষে আদালতে আবেদন করার অধিকারী। সর্ব্বোচ্চ আদালতের মতে এই নীতি অনুযায়ী উদ্ধার আশ্রমে মহিলাদের অমানবিক ব্যবস্থার মধ্যে রাখার বিরুদ্ধে যে কোন মানুষের বাদীপক্ষের তরফে আদালতে যাবার অধিকার আছে। (উপেন্দ্র বক্সী বনাম উত্তর প্রদেশ সরকার-১৯৮৩ (২) এস সি সি ৩০৮)

নিরপেক্ষ এবং দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকার

রাষ্ট্রের কাছ থেকে সকল ব্যক্তির বিচার পাওয়ার মানবিক অধিকার রাজধর্মে একটি বিধান হিসাবে দৃঢ় ভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ''ব্যবহার'' (দেওয়ানি এবং ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা) যার মাধ্যমে নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছিল তা নারদ স্মৃতিতে বিশ্লেষিত হয়েছে ঃ

धर्मैकतानाः पुरुषास्तदासन् सत्यवादिनः ।
तदा न व्यवहारोऽभुन्न द्वेषो नापि मत्सरः ॥
नष्टे धर्मे मनुष्याणां व्यवहारः प्रवर्तते ।
द्रष्टा च व्यवहाराणां राजा दण्डधरः स्मृतः ॥

''যখন জনগণ ধর্মপরায়ণ এবং সত্যবাদী ছিল তখন না ছিল ঘৃণা বা ঈর্ষা না কোন আইনগত বিবাদ। মনুষ্যজাতির মধ্যে ধর্ম আচরণ যখন কমতে শুরু করেছিল তখন আইনগত মামলার (ব্যবহার) উদ্ভব হয়েছিল এবং রাজাকে আইনগত মামলা নির্ধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। যেহেতু, 'ধর্ম' অনুযায়ী ধর্মের প্রতি আনুগত্য বলবৎ করা এবং 'ধর্ম' অমান্য করার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাজার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। (নারদ পৃ-৫১-২ ধর্মকোষ পৃ-৩)''

নারদস্মৃতির উপরোক্ত পংক্তিতে অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন যে যেহেতু স্বেচ্ছায় ধর্মের বিধান মান্য করার প্রবণতা (অতীতে যার অস্তিত্ব ছিল) মানুষের মধ্যে লোপ পেতে লাগল এবং ধর্মকে অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল এবং সেহেতু সমাজকে আইন বলবৎ করার পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। সেগুলি হল ঃ

দুষ্টের দমন, মহৎকে সম্মান জানানো, (রক্ষা করা) সু-উপায়ে কোষাগার (ধনভান্ডার) পূর্ণ করা, মামলাকারীদের নিরপেক্ষ বিচার এবং রাজত্ব রক্ষা করা— এই পাঁচটি যজ্ঞ (নিঃস্বার্থ কর্তব্য) রাজাকে পালন করতে হবে (অত্রিসংহিতা)

রাজা/আদালতকে সমস্ত মামলায় নিরপেক্ষ এবং আইন সম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হত। এইজন্য নির্দেশিকাও নথিভুক্ত করা হয়েছিল। সেগুলি ছিল ঃ

धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्य प्राड्विवाकमते स्थितः
समाहितमतिः पश्येत् व्यवहाराननुक्रमात् ॥
एवं पश्यन् सदा राजा व्यवहारान् समाहितः
वितत्येह यशो दीप्तं शक्रस्यैति सलोकताम् ॥

''রাজা গভীর মনোযোগ এবং সতর্কতা র সঙ্গে মামলার বিচার করবেন এবং আইন অনুযায়ী ও প্রধান বিচারপতির মতামত গ্রাহ্য করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। (নারদ ১-৩৫, ২৪-৭৪)

দ্রুত বিচারের জন্য কর্তব্য ঃ

न कालहरणं कार्य राज्ञा साक्षिप्रभाषणे ।
महान् दोषो भवेत्कालाद् धर्मव्यावृत्तिलक्षण: ।।
उपस्थितान् परीक्षेत साक्षिणो नृपतिः स्वयम् ।
साक्षिभिर्भाषितं वाक्यं सभ्यैः सह परीक्षयेत् ।।

(১) রাজা সাক্ষীদের পরীক্ষায় বিলম্ব ঘটাবেন না। পরীক্ষায় বিলম্ব হওয়া, একটি গুরুতর ত্রুটি অর্থাৎ, বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রতিভাত করে।

(২) রাজা নিজেই সমস্ত উপস্থিত (আদালতে) সাক্ষীদের পরীক্ষা করবেন এবং আদালতের অন্যান্য সদস্য সহ সাক্ষীর প্রদত্ত বিবৃতি বিবেচনা করবেন।" (কাত্যায়ন, ৩৩৯-৩৪০)

লোভ এবং ক্রোধ প্রতিরোধ করার কর্তব্য ঃ

धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभ विवर्जितः

কোন মামলার নিষ্পত্তির জন্য রাজা নিজের লোভ বা ক্রোধের বশবর্তী হবেন না (শুক্রনীতি IV-৫)। উপরে বর্ণিত বিধানগুলি খুবই হিতকর এবং অনুকরণযোগ্য। যেহেতু সাক্ষীরা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ঘটনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ভুলে যেতে পারে সেজন্য তাঁদের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করতে বিলম্ব করা উচিত নয়। এই মূল্যবান অধিকারগুলি মানব অধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার ১০ নং ধারায় সংযোজিত হয়েছে।

"প্রত্যেকে তার অধিকার এবং দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য বা তাঁর বিরুদ্ধে আনা কোন ফৌজদারী মামলার নিষ্পিত্তির জন্য একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচারালয়ে নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য শুনানীর সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকারী।"

এইভাবে, দ্রুত এবং আশানুরূপ ভাবে মামলার নিষ্পত্তি একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে অনুমোদন লাভ করেছে।

যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে মানব অধিকারের সুরক্ষা

অতিপ্রাচীন কাল থেকেই এদেশে মানব অধিকার অলঙ্ঘনীয় বলে বিবেচিত হত। এই কথার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এবং যুদ্ধে বিজয়ের পরও কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ ছিল যার দ্বারা বিশেষ কিছু মানব আধিকারকে শ্রদ্ধা ও সুরক্ষিত করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিল ঃ—

(ক) যুদ্ধকালীন বিধান

न कूटैरायुधैर्हन्याद्युध्यमानो रणे रिपून् ।
न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्नि ज्वलिततेजनैः ॥
न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥
न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥
नायुधव्यसनप्राप्तं नार्त नातिपरिक्षतम् ।
न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥
एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः ।
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो ध्नन् रणे रिपून् ॥

"লুক্কায়িত, কন্টকময়, বিষাক্ত অথবা প্রজ্বলিত অগ্রভাগ বিশিষ্ট কোন অস্ত্র দ্বারা রাজা কাউকে আঘাত করবেন না। তিনি রথের উপর থেকে মাটিতে বিদ্যমান কোন ব্যক্তিকে আঘাত করবেন না। তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে আঘাত করবেন না যিনি নপুংসক, বশ্যতা স্বীকার করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছেন, বসে আছেন অথবা যিনি পরাজয় স্বীকার করেছেন।

"ঘুমন্ত, নগ্ন, দর্শক, অন্যের সঙ্গে যুদ্ধরত অথবা যিনি অস্ত্রসম্ভার ফেলেছেন এমন কোন ব্যক্তিকে তিনি আঘাত করবেন না। যাঁর অস্ত্র ভেঙ্গে গেছে, যিনি তীরবিদ্ধ হয়েছেন, যিনি গভীরভাবে আহত হয়েছেন অথবা যিনি ভয়ার্ত, রাজা তাকেও আঘাত করবেন না।" (মনু-৭,৯০-৯৩-৯৮)

এটাই হল যোদ্ধাদের জন্য ঘোষিত আইন। যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ক্ষত্রিয়কে অকলঙ্কিত থাকতে হলে যোদ্ধার জন্য ঘোষিত এই নীতিগুলি অবশ্যই মান্য করে চলতে হবে। তিনি অতি অবশ্য 'ধর্মের' বিধান মেনে যুদ্ধ করবেন। একেই ধর্মযুদ্ধ বলা হয়। (মনুস্মৃতি-৭-৯৯০-৯৩ এবং ৯৮)

(খ) বশীভূত মানুষের প্রতি আচরণ।

सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम् ।
स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥
प्रमाणरनि च कुर्वीत तेषां धर्मान्यथोदितान् ।
रलैश्च पूजयेदेनं प्रधानपूरुषैः सह ॥

"(ক) বশীভূত সকল মানুষের ইচ্ছা ভালমত অনুধাবন করে তিনি পরাজিত রাজার কোন আত্মীয়কে প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে সিংহাসনে বসাবেন।

(খ) অধিবাসীদের আইনানুগ প্রথাগুলিকে স্বীকৃতি দেবেন এবং নব নিযুক্ত রাজা ও তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারকদের মূল্যবান উপহারের দ্বারা সম্মান প্রদান করবেন। (মনু-৭-২০২-২০৩)

(গ) বশীভূত জনগণের সুরক্ষা।

दुष्टस्यापि नरेन्द्रस्य तद्राष्ट्रं न विनाशयेत् ।
न प्रजानुमतो यस्मादन्यायेषु प्रवर्तते ॥

"বিজয়ী রাজা কখনই বশীভূত রাজার কোন ভুল কাজের জন্য তাঁর রাজ্য ধ্বংস করবেন না। কারণ তাঁর এই ভুল কাজের পিছনে জনগণের কোন সম্মতি নেই।" (কাত্যায়ন-২১)

যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে পালনীয় এই সকল মানবিক বিধানের ব্যবস্থা মানব অধিকার উন্নয়ন ও মান্য করার ক্ষেত্রে একটি দিক নির্দেশক বিশেষ।

গ্রন্থ সূচী

(১) আচার্য্য জগদীশলাল শাস্ত্রী ঃ মনুস্মৃতি (সংস্কৃত) জি ভুলার ঃ লস্ অব মনু (ইংরাজী)। মতিলাল বেনারসী দাস, জওহরনগর, নিউদিল্লী-১১০০৭

(২) আচার্য্য রাম শর্মা এবং ভগ্বতী দেবী শর্মা (সম্পাদকদ্বয়) ঃ অথর্ববেদ সংহিতা, ব্রহ্মবার্চস শান্তি কুঞ্জ, হরিদ্বার, ইউ পি।

(৩) আচার্য রাম শর্মা এবং ভগবতী দেবী শর্মা (সম্পাদকদ্বয়) ঋক্‌বেদ সংহিতা, ব্রহ্মবার্চস শান্তি কুঞ্জ, হরিদ্বার ইউ পি।

(৪) বিনয় কুমার সরকার ঃ শুক্রনীতি, ওরিয়েন্টাল বুকস্ রিপ্রিন্ট করপোরেশন, ৫৪ নং রাণী ঝান্সী রোড, নতুন দিল্লী-১১০০৫৫

(৫) গুস্তভ ওর্পাট (সম্পাদক) ঃ শুক্রনীতিসার, সরকারী প্রেস, মাদ্রাজ, ইন্ডিয়া (১৮৮২)।

(৬) এইচ শর্মা শেঠি (সম্পাদক) ঃ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (ইংরেজী), বিষ্ণুগুপ্ত ওরফে কৌটিল্য (সংস্কৃত) বিদ্বান এন এস ভেঙ্কটনাথচার্য্য, মহীশূর প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, মহীশূর (প্রথম সংখ্যা ১৯১৫, ইংরাজী সংখ্যা ১৯৬৭), ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মহীশূর, ১৯৩০।

(৭) বিচারপতি এম রামা জইস ঃ ধর্ম-দি গ্লোবাল এথিক্স। ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই-১৯৯৭

(৮) বিচারপতি এম রামা জইস ঃ লিগাল এ্যান্ড কনস্টিটিউনাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম-১ (এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান লিগ্যাল, জুডিসিয়াল এ্যান্ড কন্‌স্টিটিউশনাল সিস্টেম), এন. এম. ত্রিপাঠি (পি) লিঃ নং ১৬৪. শ্যামলদাস গান্ধী মার্গ। মুম্বাই-৪০০০২।

(৯) কেরী ব্রাউন ঃ দি এসেন্‌সিয়াল টিচিংস্‌ অব হিন্দুইজম, এ্যারো বুক্‌স, লন্ডন, ১৯৯০।

(১০) এম. এইচ. উইলসন এবং নাগ শর্মা সিং ঃ বিষ্ণু পুরাণ (ভল্যুম ১ এবং ২) নাগ পাবলিশালস, ৮এ/ইউ এ ৩, জওহর নগর, নতুন দিল্লী-১১০০০৭

(১১) এম. কে. গান্ধী ঃ মাই পিক্‌চার অব ফ্রী ইন্ডয়া, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, আহমেদাবাদ, গুজরাট (ইন্ডিয়া)।

(১২) এম. আর কালে (সম্পাদক) ঃ হিতোপদেশ (সর্বজ্ঞ নারায়ণ), মতিলাল বানারসীদাস, জওহর নগর, নতুন দিল্লী

(১৩) পন্ডিত জওয়ালা প্রসাদ মিশ্র (সম্পাদিত) ঃ কামন্ডকীয় নীতিসার, কামন্ডক, মোরাদাবাদ, ইউ. পি.

(১৪) স্বামী শ্রবণানন্দ ঃ তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাইলাপুর, চেন্নাই ৪

(১৫) ব্যাস ঃ মহাভারত, গোবিন্দ ভবন কার্যালয়, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ইউ. পি।